শিক্ষা ও সেবা

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক
শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মূল্য—বাঁধাই আট আনা, সাধারণ পাঁচ আনা

খাদি প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা
১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে
শ্রীহেমপ্রভা দাসগুপ্তা
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ ১৩৩৯, ভাদ্র-

প্রিণ্টার—
শ্রীচারুভূষণ চৌধুরী
খাদি-প্রতিষ্ঠান প্রেস
সোদপুর, ২৪ পরগণা

ভূমিকা

গান্ধীজীর শিক্ষা সম্বন্ধে লেখাগুলি কতক বা তাঁহার বক্তৃতা হইতে, কতক বা 'নবজীবন' হইতে এবং কতক বা অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া বোম্বাইয়ের প্রকাশক নগীনদাস অনুলথ রায় 'গান্ধী শিক্ষণ মালা'র সপ্ত ভাগ রূপে প্রকাশ করেন। উহা হইতে কতক কতক বাছিয়া লইয়া বর্তমান পুস্তকের শিক্ষা-অংশ গঠন করা হইয়াছে। নগীনদাসজীর 'শিক্ষণ মালা' গুজরাটীতে। উহারই বাংলা-অনুবাদ করা হইল। গান্ধীজীর শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্যের ভিতর একটা কথাই বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি দেশকে বিপথে লইতেছে। যাহাতে চরিত্র গড়ে—সেই রূপ শিক্ষার আবশ্যক। শিক্ষামাত্রই বই-পড়া শিক্ষা নয়। কেহ লেখা-পড়া না জানিয়াও শিক্ষিত হইতে পারে এবং এমন শিক্ষিত লোক গ্রামে গ্রামেই আছে। শিক্ষিত মানে ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান। সেই শিক্ষা কি করিয়া পাওয়া যায় ও দেওয়া যায়—তাহাই গান্ধীজী দেখাইয়াছেন। অক্ষর পরিচয় ও বই পড়ার আবশ্যক আছে। কিন্তু তাহাই বা কি ভাবে পরিচালিত করিলে মানুষের কল্যাণ হইবে—তাহাও গান্ধীজী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই শিক্ষার উদার ভিত্তির পত্তন। এই ভিত্তির উপর যাহা গড়িয়া উঠিবে, তাহাতে জাতি উন্নত হইয়া নিজেদের ও জগতের কল্যাণ করিতে পারিবে—বিদেশী শাসনও এই শিক্ষার ফলে সূর্য্যতাপে যেমন জল উবিয়া যায় তেমনি করিয়া মিলাইয়া যাইবে। এই শিক্ষা যে জাতি পাইবে তাহাদিগকে

জগতে কেহ পরাধীন করিতে পারিবে না। এই শিক্ষা লাভ করার ও প্রয়োগ করার আধুনিক ক্ষেত্র হইতেছে ভারতবর্ষের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রাম। এই শিক্ষার প্রয়োগ মানে সেবা। সেবা কেমন করিয়া করিতে হইবে ও প্রাথমিক সেবা কি—সেই শাস্ত্র গান্ধীজী দেশকে উপহার দিয়াছেন। গান্ধীজীর লেখা সংগ্রহ করিয়া 'গ্রামের বাহিরে' বলিয়া সম্প্রতি এক পুস্তিকা গুজরাটীতে বাহির হইয়াছে। উহারও অনুবাদ করিয়া এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া হইল। দ্বিতীয় ভাগের নাম দিয়াছি—'দেশের সেবায় শিক্ষার প্রয়োগ।' এই সেবা করার অধিকার সকল সেবকেরই আছে। ইহা আরম্ভে ও আচরণে সহজ, ইহা টাকার জন্য ঠেকে না, লোকের জন্য ঠেকে না, একজন লোকও নিজ ইচ্ছানুসারে নির্দিষ্ট পথে সেবা করিয়া মহাফল লাভ করিতে পারেন ও দেশের সেবা করিতে পারেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

সূচী-পত্র

প্রথম ভাগ-

দ্বিতীয় ভাগ—

প্রথম ভাগ

শিক্ষার উদ্দেশ্য

অনেক বিদ্যার্থী আমাকে জিজ্ঞাসা করে—"আমাদের কি করা ভাল, আমরা কি ভাবে দেশ-সেবা করিতে পারি, জীবিকার জন্যই বা কি করা উচিত?" আমি জানিয়াছি যে, বিদ্যার্থীরা জীবিকার জন্য খুবই ভাবিয়া থাকে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে বিচার করা আবশ্যক।

হাক্‌সলী বলিয়াছেন যে, চরিত্র গঠন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের ঋষি-মুনিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদাদি সকল শাস্ত্র জানার পরেও যে লোক আত্মাকে জানে না, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার যে যোগ্য হয় না, তাহার জ্ঞান ব্যর্থ। আবার এই প্রকার অন্য বচনও আছে যে, যে আত্মাকে জানিয়াছে সে সকলই জানিয়াছে।

বই পড়া বিদ্যা না থাকিলেও আত্ম-জ্ঞান হওয়া সম্ভব। পয়গম্বর মহম্মদ সাহেবের অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। যিশু খৃষ্ট কোনও পাঠশালায় বিদ্যা-লাভ করিয়াছিলেন না, তাহা হইলেও এই মহাত্মাগণের আত্ম-জ্ঞান ছিল না বলিলে ধৃষ্টতাই হয়। তাঁহারা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা না দিলেও আমরা তাঁহাদিগকে পূজনীয় বলি। বিদ্যার যত ফল তাহা সমস্তই তাঁহারা পাইয়াছিলেন—তাঁহারা মহাত্মা ছিলেন।

যদি তাঁহাদের দেখাদেখি আমরা বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিই তাহা হইলে আমরা ভ্রষ্ট হইব, কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমাদের আত্ম-জ্ঞান আমাদের

চরিত্র হইতেই হয়। কিন্তু চরিত্রই বা কি? সদাচারের চিহ্ন কি? সদাচারী পুরুষ, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ, অস্তেয়, নির্ভয়তা আদি ব্রতসমূহ পালন করার চেষ্টা করেন। তাঁহারা প্রাণ ত্যাগ করেন তবুও সত্য ত্যাগ করেন না। তাঁহারা নিজেরা মরেন কিন্তু অপর কাহাকেও মারেন না। তাঁহারা নিজেরা দুঃখ সহ্য করেন কিন্তু অপরকে দুঃখ দেন না। তাঁহারা নিজের স্ত্রীর প্রতি পর্য্যন্ত ভোগের দৃষ্টিতে না তাকাইয়া মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন।

এইভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সদাচারী ব্যক্তি শরীরের সার বীর্য্য-শক্তি রক্ষা করেন। সদাচারী ঘুষ খান না, নিজের অথবা অপরের সময় নষ্ট করেন না। তিনি অকারণ ধন সঞ্চয় করেন না, আরাম-আয়েস বাড়ান না, কেবল সখের জন্য অনাবশ্যক দ্রব্য রাখেন না। সাদা-সিধা ভাবে থাকিয়াই সন্তোষ পা'ন। "আমি শরীর নই—আমি আত্মা এবং জগতে কেহ এই আত্মাকে হত্যা করিতে পারে না।"—এই প্রকার ভাব মনে দৃঢ় করিয়া তাঁহারা আধি-ব্যাধি ও উপাধির ভয় ছাড়েন, রাজ-চক্রবর্ত্তীও যদি তাঁহাকে দমাইতে চাহেন তবু তিনি দমেন না, নির্ভয় থাকিয়া নিজের কাজ করিয়া যান।

যদি বিদ্যালয় হইতে উপরের লিখিত মত ফল না পাওয়া যায়, তবে বিদ্যার্থী, শিক্ষা ও শিক্ষক—এ তিনেরই ত্রুটি আছে। তবুও চরিত্রের ত্রুটি সংশোধন করার কাজ ত ছাত্রের হাতেই আছে। যদি তাহার নিজের চরিত্র শোধরাইবার ইচ্ছা না হয়, তবে শিক্ষক ও পুস্তক তাহাকে সে জিনিষ দিতে পারে না। সেই জন্য আমি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা বুঝা দরকার। যে বিদ্যার্থী চরিত্রবান হইতে ইচ্ছা

করে সে কোনও-না-কোনও পুস্তক হইতে চরিত্র বিষয়ে জ্ঞাতব্য জানিয়া লইতে পারিবে।

* * * * *

কিন্তু আমার ভয় হয় যে, অনেক বিদ্যার্থীরাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খেয়াল করে না। তাহারা সাধারণ রীতির বশেই পাঠশালায় যায়। কেহ বা জীবিকার জন্য যায়। প্রত্যেক বিদ্যার্থীই শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝিয়া এই প্রতিজ্ঞা লইতে পারে যে, আজ হইতে বিদ্যালয়কে চরিত্র গঠন করার স্থান বলিয়া বুঝিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই প্রকার বিদ্যার্থী নিজের চরিত্র খুবই পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবে ও তাহার সাথীরাও তাহার সাক্ষী দিবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা যেমন বিচার করি সেই প্রকারই হইয়া থাকি।

ডিগ্রী (উপাধি) লাভের উপর খুব টান রাখায়, পরীক্ষায় পাস করাই জীবনের অবলম্বন বলিয়া ধরায় লোকের বড় ক্ষতি হইতেছে। ডিগ্রীর দরকার তাহাদেরই, যাহারা সরকারী চাকুরী করিবে—এ কথা যেন না ভুলিয়া যাই। চাকুরেদের দ্বারা প্রজাদের ইমারত গাঁথা হইবে না। চাকুরী না করিয়াও যে সকলেই ধনী হইতে পারে, ভাল রকম ধন সঞ্চয় করিতে পারে, ইহা ত আমরা চারিদিকেই দেখিতেছি। যাহারা অশিক্ষিত তাহারা যেমন নিজের সতর্কতা দ্বারা কোটিপতি হইতে পারে, শিক্ষিত লোকেরা তেমন হইতে পারে না কেন? যদি শিক্ষিতেরা ভয় ত্যাগ করে তবে তাহাদের মধ্যেও অশিক্ষিতদের মত সামর্থ্য অবশ্যই আসিতে পারে।

শিক্ষাকে জীবিকা উপার্জ্জনের পথ বলিয়া ধরিয়া লওয়া আমার সামান্য বুদ্ধিতে নীচ বৃত্তি বলিয়া বোধ হয়। জীবিকা উপার্জ্জনের সাধন হইতেছে শরীর, আর বিদ্যালয় হইতেছে চরিত্র গঠনের সাধন। বিদ্যালয়কে শরীরের আবশ্যক মিটাইবার সাধন বলিয়া ধরা ব্যাধের জন্য মহিষ মারার মত। শরীরের পোষণ শরীর হইতেই করা চাই। আত্মাকে সে কার্য্যে কেন আটকাইয়া রাখা ?

যিশু খৃষ্ট এই মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন যে, "তোমার ঘাম দিয়াও তোমার রুটি রোজগার কর।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও এই ধ্বনি উঠিয়াছে। জগতে এক শতের ভিতর নিরানব্বই জন লোকই এই নিয়ম মানিয়া থাকে ও নির্ভয় হয়। 'যিনি মুখ দিয়াছেন তিনি আহারও দিবেন'—এটা সত্য কথা। কিন্তু অলস লোকের পক্ষে এ কথা খাটে না। বিদ্যার্থীদের প্রথমেই এই কথা শিখিয়া লওয়া দরকার যে, তাহারা যেন নিজ নিজ জীবিকা নিজ নিজ বাহু-বলেই উপার্জ্জন করিয়া লয়। জীবিকার জন্য মজুরি করায় লজ্জা নাই। আমি এ কথা বলিতে চাই না যে, আমাদের সকলকেই রোজই কোদালি মারিতে হইবে। কিন্তু এইটা বুঝা চাই যে, অন্য কাজ করিয়াও নিজ জীবিকার জন্য কোদালি মারায় এতটুকু দোষ নাই, আর আমাদের মজুর ভাইয়েরা আমাদের হইতে নীচু নয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লও, ইহাকেই আদর্শ মানিয়া লও, তাহার পর তুমি যে কাজই কর না কেন, সেই কার্য্য করার রীতিতেই শুদ্ধতা ও অসাধারণতা দেখা দিবে। মনে রাখিও যে, ইহাতে তুমি লক্ষ্মীর দাস হইবে না, লক্ষ্মীই তোমার দাসী হইয়া থাকিবেন।

* * * * *

রোজগার করার জন্য বিদ্যা-শিক্ষা করা চাই—এরূপ ভাবা ঠিক নয়। খাদ্য ত ঈশ্বরই সকলকে দিয়া থাকেন। তুমি মজুরি করিয়াও পেট ভরাইতে পার। দেশের ভালর জন্য যদি বিদ্যা-শিক্ষা করিতে চাও তবে কর, যদি আত্ম-জ্ঞানের জন্য বিদ্যা শিখিতে চাও তবে ত তাহাই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাল শিক্ষনীয় বস্তু।

যদি তুমি খাঁটি সৎগুণের অনুসরণ করিয়া থাক, যদি তোমার জীবন সদ্‌গুণময় হইয়া থাকে তবেই তুমি শিক্ষার আদর্শ পূর্ণ করিয়াছ। এই গুণে সজ্জিত হইয়া বিদ্যার কোনও অংশ বিশেষের দ্বারা তুমি তোমার জীবিকা সংগ্রহ করিতে পার ও আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর-জ্ঞানের রাস্তায় চলিতে পার।

আমি এ কথাও বলি না যে, বই-পড়া-বিদ্যাশিক্ষার দরকার নাই। কেবল এই বলি যে, ঐ বিদ্যাটার জন্য অধীর হইয়া পড়িও না। যাহাতে পরের সেবা করিতে পার সেই উদ্দেশ্যেই শিক্ষালাভ করা দরকার। ধনী হওয়া অপেক্ষা গরীব হওয়ার ভিতর বেশী আশ্বাস রহিয়াছে। ধনবান হওয়ার চাইতে গরীব হওয়া—গরীবের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করা অনেক সুন্দর—অনেক মিঠা।

* * * * *

আমাদের স্কুলগুলিতে রাজ-মিস্ত্রী, কামার, ছুতার, দরজি, মুচি ইত্যাদি জাতের ছেলেরা পড়িতে আসিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যা শিখিয়া তাহাদের পিতৃ-পুরুষের ব্যবসা বাড়াইবার বদলে ঐ সকল ব্যবসা ছোট

কাজ মনে করিয়া যদি তাহারা উহা ছাড়িয়া দেয় ও কেরাণীগিরি পাইলেই উহা সম্মান-জনক মনে করে, যদি তাহাদের মা-বাবা ও এই রকমই ভাবে, তবে আমরা জাতিভ্রষ্ট ও কার্য্যভ্রষ্ট হইয়া গোলামগিরিতে নামিয়া যাইব।

*　　　*　　　*　　　*　　　*

আজকালকার দিনে আমরা যেমন জমির দর করি তেমনি টাকায় শিক্ষারও মূল্য ধরিতে শিখিয়াছি। ছেলে যাহাতে বেশী রোজগার করিতে পারে সেই প্রকার শিক্ষা তাহাকে দিতে চাই। ছেলে কেমন করিয়া সৎ হইবে—এ হিসাব অনেকে করে না। মেয়েরা ত রোজগার করিবে না তবে তাহাদের আর শিক্ষার দরকারটাই বা কি? যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রকার থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষার মূল্য বুঝিতে পারিব না। যদি সত্যকার শিক্ষা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সকল দুঃখ—ঘর-সংসারের দুঃখ ও রাজনৈতিক দুঃখ এক ঝাপ্‌টায় মিটিয়া যায়।

বই-পড়া-বিদ্যার স্থান

যদি আমরা আমাদের সভ্যতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আমাকে দুঃখের সহিত এ কথা বলিতে হয় যে, বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা দেওয়ার যে চেষ্টা হইতেছে, উহার বেশীর ভাগই বৃথা হইতেছে। দেশী রাজারা আর আমাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ নেতারা সকল লোককেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টায় তাঁহাদের ইচ্ছা নির্ম্মল। সেই জন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহাদের এই ইচ্ছার দ্বারা যে ফল হওয়া সম্ভব সে কথা লুকাইলে চলে না।

শিক্ষা মানে কি? যদি শিক্ষা মানে বই-পড়া-বিদ্যাই হয় তবে ত উহা এক অস্ত্রের মতই হইল। উহার সৎব্যবহারও হইতে পারে—অসদ্ব্যবহারও হইতে পারে। এক অস্ত্র দিয়া অস্ত্রোপচার করিয়া রোগীকে সুস্থ করা যায় আবার সেই অস্ত্র লোকের প্রাণ হত্যা করার জন্যও ব্যবহার করা যায়। বই-পড়া-বিদ্যাও এমনি জিনিষ। ইহার ব্যবহার অনেক লোক কি ভাবে করিতেছে তাহা ত আমরা দেখিতেছি। অল্প লোকই এই বিদ্যার সৎ-ব্যবহার করিয়া থাকে। যদি এই কথা ঠিক হয় তবে ইহা প্রমাণ হইয়া যায় যে, বই-পড়া-বিদ্যার জন্য পৃথিবীর লাভের বদলে অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

সাধারণতঃ শিক্ষার মানে ধরা হয়—অক্ষর-জ্ঞান বা বই-পড়া-বিদ্যা। লিখিতে, পড়িতে ও হিসাব করিতে শেখাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হইয়া থাকে। যে চাষা উপযুক্ত রূপে চাষ করিয়া রোজগার করে, তাহার

দুনিয়ার সাধারণ জ্ঞান আছে ধরা যায়। মা-বাপের প্রতি কি ব্যবহার করিতে হয়, নিজের স্ত্রীর প্রতি কি ব্যবহার করিতে হয়, ছেলে-পিলের প্রতিই বা কিরূপ ব্যবহার করিবে, যে গ্রামে বাস করে সে গ্রামের সাধারণ চাল-চলনের সহিত কি সম্পর্ক রাখিবে—এ জ্ঞান তাহার পুরাপুরিই আছে। সে নীতির নিয়ম জানে ও পালন করে, কিন্তু কি করিয়া সহী করিতে হয় তাহা জানে না। এই প্রকার চাষাকে অক্ষর-জ্ঞান দিয়া তুমি কি করিতে চাও? কি সুখ বাড়াইবে? তাহার কুটিরের জন্য বা তাহার অবস্থার জন্য তাহার অসন্তোষ বাড়াইবে কি? যদি তাহা না করিতে চাও তবে ত তোমার তাহাকে অক্ষর-জ্ঞান দেওয়ার আবশ্যক হয় না। পশ্চিম দেশের প্রভাবের দাপে পড়িয়া আমরা এই কথাটার পিছনে ছুটিতেছি যে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু আমরা আগে-পাছে বিচার করিতেছি না।

উচ্চ-শিক্ষার কথাও ধরা যাউক। আমি ভূগোল-জ্যোতিষ শিখিয়াছি, বীজ-গণিত জানি, জ্যামিতির জ্ঞান হইয়াছে, ভু-তত্ত্ব-বিদ্যা শিখিয়া ফেলিয়াছি—তাহাতে আমার নিজের কোন্ খানটা উজ্জ্বল হইয়াছে, আমার আস-পাশই বা কি উজ্জ্বল করিয়াছি। ঐ সকল জ্ঞান আমি কেনই বা লইয়াছি? উহাতে আমার কি লাভ হইয়াছে? একজন ইংরাজ পণ্ডিত (হাক্সলি) শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত জানাইয়াছেন:—

যাহার শরীর নিজের বশে আছে, বশে থাকার শিক্ষা পাইয়াছে তাহারই ঠিক শিক্ষা লাভ হইয়াছে। তাহার শরীর নিরুদ্বেগে ও সরলতার সহিত শরীরের যে কাজ করা উচিত সে কাজ করে। তাহারই খাঁটি শিক্ষা লাভ হইয়াছে যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ, শান্ত ও ন্যায়দর্শী হইয়াছে। সেই সত্য শিক্ষা পাইয়াছে যাহার ইন্দ্রিয় সকল বশে আছে, যাহার অন্তরের

বৃত্তিগুলি শুদ্ধ হইয়াছে, যে নীচ কাজ করিতে ধিক্কার বোধ করে, ও অপরকে নিজের সমান গণ্য করে। এই প্রকার লোককেই সত্য সত্য শিক্ষিত বলিয়া ধরা যায়, কেননা সে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী চলে। প্রকৃতি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করে, সেও প্রকৃতিকে ভাল কাজে খাটায়।

* * * * *

যদি ইহাই সত্য শিক্ষা হয় তবে আমি যে সকল শাস্ত্রের কথা উপরে লিখিলাম তাহার প্রয়োগ আমার ইন্দ্রিয় সকল বশ করার কাজে লাগে না। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাই বল আর উচ্চ শিক্ষাই বল কোনটাতেই ও গুলি প্রধানতঃ কাজে আসে না। ঐ সকল জানিয়া আমারা মানুষ হই না, আমাদের কর্ত্তব্য কি সে কথা উহা হইতে জানিতে পারি না।

* * * * *

যেখানে বিচার-বুদ্ধি আছে সেখানে বই-পড়া-বিদ্যার আবশ্যক কমই আছে। যে মোক্ষ কি বুঝিয়াছে, যাহার আত্ম-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাহার বেদ পড়ার আর দরকারটা কোথায়? যাহার পেট ভরিয়াছে তাহার ক্ষীরে কি প্রয়োজন? যে হিমালয়ে গিয়াছে, হিমালয়ে যাওয়ার পথ-প্রদর্শন পুস্তকে তাহার কোন্ প্রয়োজন? সেই জন্যই বলি—সাধারণ লোকের উন্নতির জন্য অক্ষর-জ্ঞান যত দরকার তাহা অপেক্ষা বেশী দরকার বিচার-বুদ্ধি পাওয়া।

শিক্ষা মানে অক্ষর জানা নয়, বই-পড়া-বিদ্যা নয়, উহার মানে চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলা, মানে ধর্ম্ম-ভাবের জ্ঞান লাভ করা। সকল রকম পড়াশুনার পর আমার ইহাই স্থির বিশ্বাস হইয়াছে। যে শিক্ষাদ্বারা আত্ম-সম্মান জ্ঞান লাভ করা যায় না সে শিক্ষার কি প্রয়োজন? যদি আবশ্যক হয় তবে নিজে দুঃখ সহ্য করিয়াও সঙ্গীদের মান বাঁচাইতে হয়। তাহাদিগকে অন্যায় হইতে রক্ষা করাতেই পুরুষার্থ। নিজেরা যাহাতে মনুষ্য হইতে পারি ইহাই প্রথম শিক্ষা। যে মানুষ হইয়াছে সেই অক্ষর-জ্ঞান পাওয়ার বা বই-পড়া-বিদ্যা শিক্ষার যোগ্য। যে মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া বসিয়াছে তাহাকে অক্ষর-জ্ঞান কি দিবে? বই-পড়া-বিদ্যায় মনুষ্যত্ব লাভ হয় না।

* * * * *

মানুষ হওয়াই প্রাথমিক শিক্ষা বলিয়া মনে করি। এখন ত পুরুষ পুরুষত্ব ও স্ত্রী স্ত্রীত্ব খোয়াইয়া বসিয়াছে। সকল লোক এক বাক্যে বলিতেছে যে, যদি আমরা পরাধীনতা সহ্য করিতে না পারি তবেই আমাদের স্বরাজ লাভ হয়। বাস্তবিক শিক্ষা ধীরে ধীরে আসে না, যাহার আসে তাহার একবারেই আসে, উহা এক নূতন জন্ম লাভ করার মত।

* * * * *

মানুষের প্রকৃত কাজই হইতেছে কি করিয়া নিজের চরিত্র গড়া যায় তাহাই শিক্ষা করা। রোজগারের জন্য বিশেষ কিছু শিখিয়া লওয়া তাহার

কাজ নহে। যদি মানুষ ঠিক পথ না ছাড়িত তবে না খাইয়া মরিত না। আর যদি মরিতেও হইত তবে সে মরণে ভয়ও পাইত না। নিজের বিচার-বুদ্ধি যাহা অবশ্য করণীয় বলে, তাহা করিতে যদি ভবিষ্যতে কি ফল হইবে এ হিসাব না করা হয় তবে তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম—উহাই ধর্ম্ম।

যতদিন পর্য্যন্ত তোমরা দৃঢ়ভাবে নীতিপথে থাকিবে, তোমাদের কর্ত্তব্য করিবে ততদিন আমি তোমাদের অক্ষর-জ্ঞান বা বই-পড়া-বিদ্যার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিব। শাস্ত্রে যে যম নিয়মাদির উল্লেখ আছে তদনুসারে যদি আচরণ করা হয় তবেই যথেষ্ট। তোমরা সখ করিয়া অথবা আরো জ্ঞান বাড়াইবার জন্য যদি অক্ষর-জ্ঞান বাড়াও তবে আমি তাহার সহায়ক হইব। তোমারা তাহা না করিলে, বই-পড়া-বিদ্যা না শিখিলেই যে আমি দোষ দিব এমন নয়। যাহা হউক মনে একটা সঙ্কল্প করিবে ও তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।

পরোপকার করা, পরের সেবা করা ও সে সেবা করিতে গিয়া নিজকে এতটুকুও বড় না মনে করা—ইহাতেই সত্য শিক্ষা রহিয়াছে। যতই তোমাদের বয়স বাড়িবে ততই ইহা বেশী বুঝিবে। পীড়িতের সেবা করার মত উত্তম কার্য্য আর কি আছে? উহাতে সকল ধর্ম্মের সমাবেশ রহিয়াছে।

যে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাকে সে সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাকে। তোমরা সেবা করার অভ্যাস করিতেছ। সেবা করিতে গিয়া যদি অক্ষর-জ্ঞান, বই-পড়া-বিদ্যা বিসর্জ্জন দেওয়া যায় তবে তাহাতে ক্ষতি নাই। বই-পড়া-বিদ্যা পরেও পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেবা করার অবকাশ পরে না-ও আসিতে পারে। যদি নিজের মনে

এইটা গভীরভাবে আঁকিয়া লইতে পার যে, তোমার মন নির্ম্মল থাকিবে তবে সেবা করিবার কাজে ব্যারামে পড়িবে না। আর যদি পড়ও তবে নিশ্চিন্ত থাকিবে। ভাল জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করাই বিদ্যাভ্যাস, আর সকলই মিথ্যাভ্যাস বা মিথ্যার পাঠ লওয়া।

* * * * *

আমরা অভ্যাস করার পর যাহা বলি বা করি তাহা যে বই-পড়া-বিদ্যা হইতে করি এমন নয়। কেন না যদি আমি প্রাথমিক শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা না-ই পাইতাম তাহা হইলেও যে আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিতাম এমন ত নয়। এখন বলিতে পারি—ইহা লইয়া অভিমান করিতে নাই, বরঞ্চ আমি সেবার উপযুক্ত হওয়ার ইচ্ছাই রাখি এবং সেই ইচ্ছা রাখিয়া যাহা পড়িয়াছি তাহা কাজে লাগাইতেছি। কিন্তু সে ব্যবহার আমার কোটি কোটি ভাইয়ের কাজে লাগাইতে পারি না, কেবল তোমার মত লোকের কাজেই লাগাইতে পারি—যদি এই রূপই হয়, তবু আমি যে বিচার করিয়াছি তাহাই সমর্থিত হয়। তুমি ও আমি উভয়েই খারাপ শিক্ষার ফাঁদে পড়িয়াছি। আমি মনকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি। আমার অভিজ্ঞতার কথা তোমাকে জানাইতেছি ও জানাইতে গিয়া আমার প্রাপ্ত শিক্ষার ব্যবহার করিতেছি—তোমাকে পরামর্শ দিতেছি।

তবে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, আমি সমস্ত অবস্থাতেই বই-পড়া-বিদ্যার বিরোধী নহি। আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, ঐ কেতাবী

বিদ্যাকে আমরা যেন মূর্ত্তির মত করিয়া পূজা না করি। উহা আমাদের কাম-ধেনু নয়। উহার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, সেইখানেই উহা শোভা পায়। আর সে জায়গা সেইখানে যেখানে তুমি ও আমি আমাদের ইন্দ্রিয় বশ করিয়া ফেলিয়াছি। যখন আমরা নীতির ভিত্তি দৃঢ় করিয়া ফেলি তখন যদি বই-পড়া-বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা হয় তবে অবশ্য তাহার সৎব্যবহার করিতে পারি। উহা অলঙ্কার রূপে শোভা পাইবার সম্ভাবনা আছে। যদি কেতাবী বিদ্যার ব্যবহার এইরূপেই করিতে হয় তবে তাহার জন্য বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আবশ্যক নাই। সে জন্য আমাদের পুরানো পাঠশালাগুলিই যথেষ্ট। সেখানে নীতি-শিক্ষা প্রথমে দাও, উহাই প্রাথমিক শিক্ষা। যে ইমারত খাড়া করিতে চাই উহার উপরই তাহা খাড়া করিতে পারিব।

* * * * *

বিদ্যার্থীদিগকে কেবল মানসিক শিক্ষা দেওয়া বড়ই অসম্পূর্ণ জিনিষ। যদি মনের, হৃদয়ের ও শরীরের শিক্ষা সমান ভাবে দেওয়া যায় ও শরীর ঐ তিনকেই পোষণ করে, তবেই সে শিক্ষা ভারতবর্ষের হিতকরী হইবে। মনের বিকাশ আমরা ভাষার মধ্য দিয়াও লাভ করিতে পারি, কিন্তু হৃদয়ের—আত্মার বিকাশ কেবল ধর্ম্ম দ্বারাই হইতে পারে। ধর্ম্ম-শিক্ষা তখনই বিদ্যার্থী গ্রহণ করিতে পারে যখন শিক্ষক ধর্ম্ম আচরণ করে। যদি শিক্ষকের প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্ম-ভাব দেখা যায়, তাহা হইলেই বিদ্যার্থী সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। শরীরের

শিক্ষা—চাষের কাজে বা বুনাইবার কাজে শিক্ষক নিজের শরীর খাটাইয়া দিতে পারেন।

প্রত্যেক শিক্ষক প্রত্যেক পাঠশালায় এই শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করিয়া দিতে পারেন। এজন্য অপরের দিকে, বা কবে স্বরাজ্য আসিবে সে দিকে তাকাইয়া থাকার দরকার নাই। যদি কোথাও বীজ বপন করা যায় তবে সেখানে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অপরকেও প্রভাবিত করিতে পারে।

শিক্ষিত হওয়ার আবশ্যক আছে। অক্ষর-জ্ঞান বা বই-পড়া বিদ্যা চাই। কিন্তু উহাই সর্ব্বস্ব নয়। উহা ত সাধ্য নহে উহা সাধন মাত্র। যাহার জ্ঞান হইয়াছে তাহার যদি অক্ষর-জ্ঞান না-ও থাকিত তবে ক্ষতিটা কোথায়? পৃথিবীর মহাশিক্ষক ও সংস্কারকদের অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। যিশু, মহম্মদ—ইঁহাদের অক্ষর জ্ঞান ছিল কি? তবু তাঁহারা যে জ্ঞান দিয়াছেন, যে সেবা করিয়াছেন তাহা মহান তত্ত্ব-বেত্তা ও অর্থ-শাস্ত্রীদের কাছে পাওয়া যায় নাই—যাইবেও না। বোয়ারদিগের সভাপতি ক্রুগারের অক্ষর-জ্ঞান এই পর্য্যন্ত ছিল যে, তিনি বহু কষ্টে নাম সহী করিতে পারিতেন। আফগানিস্থানের গাজী আমিরের বিদ্যাও এই রকমেরই ছিল। কিন্তু এই দুই জনেরই বুঝিবার অসীম ক্ষমতা ছিল।

অসাধারণ পুরুষদের কথাই আমি বলিতেছি—এ কথা কেহ বলিতে পারেন। ইহা সত্য, তবুও উহা হইতে আমি দেখাইতেছি যে, লেখা-পড়া না জানিলেই চলে না, এমন নয়। আজো পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকের লেখা-পড়া জানা নাই। তাহা না থাকিলেও তাহারা জড়-বুদ্ধি নয়। তাহাদের শক্তিতেই আমরা বাঁচিয়া আছি। তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের জোরেই

সংসার-চক্র চলিতেছে। এই সব লেখার তাৎপর্য্য এই যে, যতদিন লড়াই চলিবে ততদিন যদি আমাদের ছেলে-পেলেরা লেখাপড়া না-ই করে তবে তাহাতে তাহাদের এবং জন-সাধারণেরই লাভ। যে বাড়ীতে বায়ু বিষাক্ত হইয়াছে সে বাড়ী কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দেওয়াই যেমন বুদ্ধিমানের কাজ, তেমনি বিষের সমান সরকারের স্কুলগুলি ছাড়িলেও লাভই। যে বাপ-মা এতটুকুও বুঝে না তাহারা স্বরাজ্য পাওয়ার জন্যও ব্যস্ত হয় নাই।

ধর্ম্ম-শিক্ষা

বিদ্যার্থীর জীবন নির্দ্দোষ হওয়া চাই। যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ সেই নির্দ্দোষ আনন্দ পাইতে পারে। তাহাদিগকে সংসারে আনন্দ লইতে বলিলেই আনন্দ লওয়ার কাজের ফল হয়—তাহারা উহা পাইতে পারে। যাহার এই সঙ্কল্প আছে যে, 'আমাকে উচ্চ হইতে হইবে,' তাহার সে উচ্চতা মিলে। নির্দ্দোষ বুদ্ধি হইতেই রামচন্দ্র চন্দ্র পাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি তাহা পাইয়াছিলেন।

এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে জগত মিথ্যা, আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলে জগত সত্য বোধ হয়। বিদ্যার্থীর নিকট ত জগত আছেই, কেন না তাহাদিগকে এই জগতেই পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে। রহস্য না বুঝিয়া জগতকে মিথ্যা বলিয়া যাহারা স্বেচ্ছাচার করে ও জগতকে ত্যাগ করার দাবী যাহারা করে তাহারা সন্ন্যাসী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যে মিথ্যাজ্ঞানী তাহাতে ভুল নাই।

যেখানে ধর্ম্মের অভাব সেখানে বিদ্যা, লক্ষী, স্বাস্থ্যেরও অভাব। ধর্ম্ম-শূন্য অবস্থা একেবারেই শুষ্ক অবস্থা—শূন্য অবস্থা। ধর্ম্ম কি যদি তাহা জানা না থাকে তবে বিদ্যার্থীরা নির্দ্দোষ আনন্দ পাইতেই পারে না। এই আনন্দ পাওয়ার জন্য শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্র চিন্তা ও বিচার অনুযায়ী আচার করা আবশ্যক।

কিন্তু ধর্ম্ম জিনিষটা কি ? ধর্ম্মের শিক্ষা কি প্রকারে হইতে পারে ? এ কথার বিচার এ স্থানে হইতে পারে না। তবে এইটুকু কাজের

পরামর্শ নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া দিতে পারি যে, তোমরা 'রাম-চরিত মানস' ও 'ভগবদ্গীতার' ভক্ত হইও। তোমাদের নিকট মানস রূপ কোহিনূর আসিয়া পড়িয়াছে—তোমরা তাহাকে তুলিয়া লও। এইটুকুই শুধু স্মরণ রাখিও যে, কেবল ধর্ম্ম বুঝিবার জন্যই এই দুইখানা গ্রন্থ পাঠ করিবে। এই গ্রন্থ যাঁহারা লিখিয়াছেন সেই ঋষিদের ইতিহাস লেখার মতলব ছিল না। তাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ দেওয়ার জন্যই লিখিয়াছেন। কোটি কোটি লোক এই গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করে ও নিজের জীবন শুদ্ধ করে। তাহারা নির্দ্দোষ বুদ্ধি হইতে উহা পাঠ করিয়া উহা হইতে নির্দ্দোষ আনন্দ পাইয়া এই সংসারে বিচরণ করে।

রাম ছিলেন কিনা, তিনি যেমন শত্রু বধ করিয়াছিলেন তেমনি আমি আমার শত্রু বধ করিব কি করিব না—এই প্রকার সংশয় সপ্নেও তাহাদের আসিতে পারে না। তাহারা শত্রুকে দেখিয়াও রামচন্দ্রের কৃপা পাইয়া নির্ভয় থাকে। রামায়ণ-রচয়িতা তুলসীদাসজীর নিকট একটা মাত্র অস্ত্র ছিল—উহা হইতেছে দয়া। তুলসীদাজীর কাহাকেও সংহার করার ইচ্ছা হইত না। যিনি উৎপন্ন করেন তিনিই নাশ করেন। রাম ঈশ্বর ছিলেন, তিনিই রাবণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারই নাশ করার অধিকার ছিল। যখন আমরা ঈশ্বরের পদ পাইব, তখন সংহার-শক্তি সম্বন্ধে আমরাও আমাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া লইব। এই মহান্ গ্রন্থ দুইখানা সম্বন্ধে এই প্রকার ভূমিকা করার ধৃষ্টতা করিতেছি। আমি নিজে এক সময় সংশয়াত্মা ছিলাম। আমার বিনষ্ট হওয়ার ভয়ও ছিল। সেই অবস্থা অতিক্রম করিয়া আজ শ্রদ্ধালু হইতে পারিয়াছি। এই পুস্তক

দুইখানা আমার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা জানানো উচিত মনে করিয়াই জানাইলাম।

ইসলামী বিদ্যার্থীর জন্য 'কোরান-শরীফ' সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাহাদিগকেও ধর্মভাব হইতে এই গ্রন্থের পাঠের জন্য আমি পরামর্শ দিতেছি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস—হিন্দু-মুসলমানের প্রত্যেকের পরস্পরের ধর্ম্ম-গ্রন্থ বিনয়পূর্ব্বক পড়া দরকার ও বুঝা দরকার।

স্ত্রী-শিক্ষা

পুরুষদের শিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা যেমন ত্রুটি-পূর্ণ, স্ত্রীলোকদের শিক্ষাও তেমনি। ভারতবর্ষে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ কি, স্ত্রীলোকেরা জন-সাধারণের মধ্যে কি স্থান লইয়া আছে তাহার আলোচনা করিতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা মোটের উপর উভয়েরই এক প্রকার। কিন্তু তাহার উপরে গেলে উভয়ের ভিতর খুব অসমানতা রহিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষের ভিতরে প্রকৃতি যেমন ভেদ রাখিয়াছে, শিক্ষাতেও তেমনি ভেদ থাকা আবশ্যক। সংসারে দুই জনই সমান, কিন্তু তাহাদের কার্য্যের ভিতর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহের রাজ্য ভোগ করার অধিকার স্ত্রী-লোকের, আর বাহিরের ব্যবস্থার কর্ত্তা হইতেছে পুরুষ। পুরুষ উপার্জ্জন করিয়া আনিবে, স্ত্রী তাহা সঞ্চয় করিবে ও ব্যয় করিবে।

স্ত্রী বালকদিগের পোষণকারিণী—তাহাদের ধাত্রী। বালকদিগের চরিত্র নারীর উপরই নির্ভর করে। সেই জন্য তাহারাই বালকদিগের শিক্ষয়িত্রী ও মনুষ্য জাতির মাতা। মানুষের পিতা (পালন কর্ত্তা) কিন্তু পুরুষ নয়। একটা বিশেষ সময়ের পর পুত্রের উপর পিতার প্রভাব কমই হয়। মাতা কিন্তু নিজের অধিকার বা প্রাপ্য স্থান কখনই ছাড়েন না। বালক যখন বড় হয় তখনো মায়ের কাছে বালকের মতই আব্দার করে। কিন্তু পিতার সহিত সে এই সম্বন্ধ রাখিতে পারে না।

এইরূপ ব্যবস্থাই স্বাভাবিক হওয়ার যোগ্য। স্ত্রীলোকদের জন্য ভিন্ন রোজগার করার ব্যবস্থার আবশ্যক নাই। যেখানে নারীদিগকে টেলিগ্রাম-

মাষ্টার, বা টাইপিষ্ট, বা কম্পোজিটারের কাজ করিতে হয় সেখানে দেখা যাইবে যে, সুব্যবস্থা ভঙ্গ হইয়াছে। সেখানকার জন-সাধারণের শক্তি দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে বলা যায়। আমার মনে হয়, সে জাতি নিজের মূলধন ভাঙ্গাইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এক দিকে যেমন স্ত্রীলোকদিগকে অন্ধকারে ও হীন অবস্থায় রাখা খারাপ, তেমনি অন্য দিকে আবার তাহাদিগকে পুরুষের কর্ম্মভার দেওয়াও দুর্ব্বলতার চিহ্ন। তাহা স্ত্রীলোকদের উপর জুলুম করার মতোই হয়। তাই স্ত্রীলোকদের জন্য একটা বয়সের পর হইতে আলাদা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। গৃহ-ব্যবস্থা, গর্ভের যত্ন করা, ছেলেপিলে পোষা, ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান এবং শিক্ষা লাভ করা ইত্যাদি ক্রমশঃ নূতন নূতন বিষয় তাহাদের শিখিবার আছে। এই সব বিষয় খুঁজিয়া বাহির করার ও স্থির করার জন্য চরিত্রবতী ও জ্ঞানবতী স্ত্রী ও অভিজ্ঞ পুরুষদের মণ্ডল গঠন করা দরকার।

স্ত্রী ও পুরুষ একই শ্রেণীর হইলেও এক নয়। স্ত্রী-পুরুষে অপূর্ব্ব জুড়ি। একে অন্যের অভাব পূরণ করিয়া পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছে। এমনই এই জোড় যে, একের অভাবে অপেরের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। পুরুষ বল আর স্ত্রী বল, যদি কেহ স্থান-ভ্রষ্ট হয় তবে দুই জনেই বিনষ্ট হয়। উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। যাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা গড়িবেন তাঁহাদের এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। দম্পতির মধ্যে বাহিক কর্ম্ম-চেষ্টায় পুরুষই প্রধান। সুতরাং সেই বাহ্য ক্রিয়া-কর্ম্মের জ্ঞান পুরুষের থাকা চাই। আন্তরিক প্রবৃত্তিতে স্ত্রীলোকদেরই প্রাধান্য। সেই জন্য গৃহ-ব্যবস্থা, ছেলেদের পালন ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে স্ত্রীলোকদের বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই।

স্ত্রী-শিক্ষাকে আমরা কেবল কন্যা-শিক্ষাতেই শেষ করিতে পারি না। হাজারো কন্যা বাল্য বিবাহের কবলে পড়িয়া বারো বৎসর বয়সেই আমাদের চক্ষের সম্মুখ হইতে লোপ পাইয়া যায়। তাহারা গৃহিণী বনিয়া বসে! এই পাপ-পূর্ণ নিয়ম যতদিন আমাদের মধ্য হইতে না যায় ততদিন পুরুষকেই স্ত্রীলোকের শিক্ষক হইতে হইবে। তাহাদের এই শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে আমাদের অনেক আশা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের নারীদিগকে আমাদের ভোগের পাত্রী বা আমাদের পাচিকার কোঠা হইতে মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে সহচরী, আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী, আমাদের সুখ-দুঃখের ভাগী যতক্ষণ না করা হইবে ততক্ষণ আমাদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইবে।

যে পুরুষ বালিকাকে বিবাহ করে সে পরোপকারের দৃষ্টিতে কাজ করে না, বেশীর ভাগই ভোগের আসক্তি হইতে কাজ করে। এই বালিকাদের সহায় কে আছে? এই প্রশ্নের উত্তরের ভিতরেই স্ত্রীলোকদের উদ্ধারের ব্যবস্থা বেশীর ভাগ নির্ভর করে। উত্তর কঠিন—কিন্তু উত্তর একটাই। সে উত্তর হইতেছে এই—বালিকাদের সংসারের সাথী আর কেহ নাই। যে পুরুষ বালিকাকে বিবাহ করিয়াছে তাহার স্ত্রী তাহাকে বুঝাইবে ইহা এক প্রকার অসম্ভব, সেই জন্যই এই বিষম সংস্কারের কাজ পুরুষকেই করিতে হইবে।

যতদিন বাল্য বিবাহের ফাঁস আমাদের থাকিবে ততদিন পুরুষকেই নিজ নিজ স্ত্রীর শিক্ষক হইতে হইবে। কিন্তু এই শিক্ষা কেবল পুঁথি-পড়া নয়। ধীরে ধীরে রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কার বিষয়েও তাহাদিগকে প্রবেশ করাইতে হইবে; এই কাজ করার জন্য প্রথমেই যে অক্ষর-জ্ঞান থাকা দরকার এমন নয়। এই কাজ করিতে হইলে পুরুষকে স্ত্রীর প্রতি

ব্যবহার বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত স্ত্রী উপযুক্ত বয়সের না হয় ততদিন তাহাকে শিক্ষাবস্থায় রাখিতে হইবে ও সে পর্য্যন্ত পুরুষ তাহার প্রতি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। পুরুষেরা জড়তার শক্তির চাপে পিষ্ট না হইলে ১২ হইতে ১৫ বছরের বালিকার উপর কখনও প্রসবের মহাব্যথার বোঝা চাপাইত না। এ কথা ভাবিতেও আমাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠা দরকার।

সরকারী শিক্ষার ত্রুটি

সরকারী শিক্ষার এখনকার প্রচলিত প্রথায় আমার দৃষ্টিতে যে তিনটা বিষয়ে অত্যন্ত ত্রুটি আছে তাহা এই :—

১। এই শিক্ষা পরের দেশের সংস্কারের উপর গঠিত। বিদেশী সংস্কারের এতটা বাড়াবাড়ি উহাতে আছে যে, তাহা দেশীয় সংস্কারকে একেবারে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

২। হৃদয়ের শিক্ষা ও হাতের শিক্ষার মধ্যে বড়ই অসমানতা রহিয়াছে। কেবল মাথা খোলার দিকেই ইহা পুরা জোর দিয়াছে।

৩। পরের ভাষার ভিতর দিয়া সত্যকার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

এখন এই ত্রুটি তিনটির আলোচনা করিব।

ছেলে-মেয়েদের পারিবারিক জীবনে যে সকল বিষয় প্রতিদিন আবশ্যক হয়, এই শিক্ষায় সে সকল বিষয় চল্‌তি পাঠ্য পুস্তক হইতে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া আছে। গৃহস্থ-জীবনে ভাল কি অথবা মন্দ কি—তাহা ছেলে-মেয়েরা স্কুল-পাঠ্য পুস্তক হইতে শিখিতে পারে না। যে সব আদর্শ তাহার সম্মুখে রহিয়াছে সেগুলিতে অভিমান রাখার—গর্ব্ব অনুভব করার কথা তাহাদিগকে শিখানো হয় না। তাহাদের গৃহ-জীবন যে রসময় তাহা তাহাদিগকে জানিতেও দেওয়া হয় না। তাহাদের গ্রামের চিত্র তাহাদের নিকট জীবনহীন করিয়া দেখানো হয়। তাহাদের সভ্যতা ফাঁকা, জঙ্গলী, ভুলে ভরা ও সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য—এই কথাই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের শিক্ষা তাহাদিগকে নিজেদের সভ্যতার প্রতি বিমুখ

করে বলা যায়। আর যদি শিক্ষিত ছেলেদের বেশীর ভাগই রাষ্ট্রীয় ভাবনা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ না হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ—প্রাচীন সংস্কার তাহাদের মধ্যে এত বেশী ওতঃপ্রোত হইয়া আছে যে, শিক্ষা তাহার বাড় বন্ধ করিলেও তাহাকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই।

যদি আমার কথা চলিত তবে আমি এখানকার বিদ্যালয়ে যে সকল বই পড়ানো হয় তাহার বেশীর ভাগই নষ্ট করিয়া ফেলিতাম ও গৃহ-জীবনের সহিত সম্বন্ধ রাখার যোগ্য বইগুলি বিদ্যালয়ে চালাইতাম। তাহা হইলে ছেলেরা শিক্ষিত হইয়া তাহাদের চারিধারের আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত।

অন্য দেশের সম্বন্ধে ইহা সত্য হউক বা না হউক, কিন্তু ভারতবর্ষে যেখানে শতকরা ৮০ জন লোক চাষা ও দশজন শ্রমজীবী, সেখানে ফাঁকা বই-পড়া-বিদ্যা শিখানো ও ছেলে-মেয়েকে ভাবী জীবনে হাতের কাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী করিয়া তোলা একটা অতি গুরুতর অপরাধ। আমি ত মনে করি যখন আমাদের বেশীর ভাগ সময় জীবিকা-উপার্জ্জন করিতেই যায় তখন ছেলে-পিলেকে বাল্যকাল হইতেই হাতে কাজ করার গৌরব বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। মজুরী করিতে অবজ্ঞা করা কখনো আমাদের ছেলেদিগকে শিখানো উচিত নয়। চাষার ছেলেরা স্কুলে যাওয়ার পর মজুরের কাজের অযোগ্য হয়। কিন্তু তেমন হওয়ার আসলে ত কোনই হেতু নাই। আমাদের ছেলেরা হাতের কাজকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিলেও যদি উহা অরুচির সহিত দেখে তবে তাহাও দুঃখের কথা বলা যায়।

যদি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক-বালিকাকে সার্ব্বজনীন বিদ্যালয়ে পড়াইবার ইচ্ছা রাখি তবে এখানকার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত খরচ করার শক্তি আমাদের নাই। আর এখানকার বিদ্যালয়ের যে বেতন লওয়া হয় তাহাও লাখো বাপ-মার দেওয়ার সামর্থ্য নাই। সেই জন্য যদি সার্ব্বজনীন করিতে হয় তবে উহা অবৈতনিক করা চাই। আমি ত মনে করি যে, সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত বালক-বালিকাকেই স্কুলে পাঠাইতে হইলে আমাদের যে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে, উৎকৃষ্টতম গবর্ণমেণ্টকেও সে খরচ করার শক্তি দিতে আমরা পারিব না। সেই জন্যই আমি মনে করি যে, ছেলেরা যে শিক্ষা পায় তাহার বদলে তাহাদিগকে কোনও-না-কোনও মজুরী করিতে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

লাভের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই প্রকার সার্ব্বজনীন মজুরী হইতে পারে—হাতে কাপড় বোনা ও হাতে সূতা কাটা। তবে আমরা সূতা কাটাকেই রাখিব কি অন্য কোনও মজুরী রাখিব—সে কথা আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রয়োজন নাই। মোদ্দা কথা এই যে, যে-কোনও মজুরী লাভ-দায়ক হইলেই হইল। তবে একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে, সারা হিন্দুস্থানের স্কুলে লাভ-দায়ক ভাবে চালানো যাইতে পারে এমন কাজ কাপড় উৎপন্ন করা ছাড়া আর কিছুই নাই।

আমাদের শিক্ষা এমন হওয়া চাই যাহাতে আমাদের পোষণ হয়, আমরা স্বাধীন ও তেজস্বী হই। যদি আমরা আমাদের জন-সাধারণের শক্তি বাড়াইতে চাই তবে চরখা তাহার একমাত্র উপকরণ। শিক্ষা দেওয়ার জন্য চরখার সংযোগ অপূর্ব্ব। যদি বিদ্যালয়ে চরখা চলে তবে

বিদ্যালয় চালাইবার জন্য ভিক্ষা করিতে হয় না। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, মন দিয়া যে ছেলে চরখা কাটিবে সে ঘণ্টায় পাঁচ তোলা সূতা কাটিয়া নিজের বিদ্যালয়ের জন্য ঘণ্টায় দুই পয়সা অথবা ২৫ দিন ৪ ঘণ্টা করিয়া কটিয়া ৩৵০ আনা দিতে পারে। আমি উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশী করিয়া ধরিয়াছি। কিন্তু প্রতি মাসে গড়ে ২৲ টাকা করিয়া দিলেও ২০ জন ছেলের ক্লাস হইতে ৪০৲ টাকা আয় হয়। ভাল মাষ্টারের জন্য ভালো ছেলেরা মাসে ৬০৲ টাকা দিবে।

বিশেষ অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে, বালকেরাই ধুনিয়া তাহারাই পাঁজ করিয়া লইবে। ধুনিতে ও পাঁজ করিতে যদি অতিরিক্ত সময় দেওয়া যায় তবে তাহাতে যে সময় যাইবে সে জন্য কম করিয়া চার পয়সার বদলে যদি দুই পয়সাই ধরা যায় তবু ২৫ দিনে আরও পঞ্চাশ পয়সা আয় হয়। অর্থাৎ ভাল ছেলেরা ৩৸৵১০ হিসাবে তাহাদের বিদ্যালয়ে দিতে পারে।

যখন বিদ্যালয়ে সূতাকাটা ও কাপড় বোনার কাজ চলিবে তখন কার্পাস ইত্যাদি প্রথম হইতেই যোগাড় করিয়া রাখিলে বাজার-দাম অপেক্ষাও সূতার মূল্য কিছু বেশী পাওয়া যাইতে পারে। এক সের সূতায় অন্ততঃ দুইটি করিয়া পয়সা অতি সহজেই বাঁচানো যায়। এই সমস্তের দাম যদি হিসাব করা যায়, তবে চারিদিক হইতে কতটা আয় হইবে—সে কথা যাহারা কারখানা চালায় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝা যাইবে। লক্ষ লক্ষ বালক যদি স্কুলে পড়িতে থাকে, তাহারা যদি এই কাজ শিখিয়া ফেলে, তাহারা যে পরিশ্রম করে তাহার মূল্য যদি ধরা যায় ও তদ্বারা সূতার বাজারের উপর যদি দখল অর্জ্জন করা যায় তবে লাভ কত বেশী হয়

তাহা যখন হিসাব করিতে বসি তখন এই কথাই মনে হয় যে, প্রজারা যদি এই সিধা কথাটা শিখিয়া ফেলে তবে দেশবাসীর অনাহারে থাকার অবস্থাটা অল্প সময়েই দূর হইয়া যায়।

আর একটা বিষয় রহিয়া গিয়াছে, উহা হইতেছে পাঠশালাতেই বস্ত্র-বোনার ব্যবস্থা। যদি এই ব্যবস্থা করা যায় তবে স্কুলের আয়ের পথ আরো বাড়িয়া যায়। যদি সুতা কাটায় ঘণ্টায় দুই পয়সা ধরা হয় তবে বয়নকারী (তাঁতি) ঘণ্টায় এক আনা ত সহজেই রোজগার করিবে। কিন্তু এখনকার মত যদি বোনাইটা হিসাবের মধ্য হইতে বাদও দেওয়া যায়, প্রত্যেক বিদ্যার্থী মাসে কেবল চার টাকা রোজগার করিয়াই যদি দিতে থাকে তবু স্কুলের জন্য 'গ্রাণ্টের'ও আবশ্যক হয় না—দানেরও আবশ্যক হয় না। সে বিদ্যালয় স্বাবলম্বী হয়, বালকদিগকেও বেতন দিতে হয় না। এইরূপে এক দিকে বেতন না লওয়া এবং আর এক দিকে উত্তম শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত আমরা চরখার সাহায্যেই গড়িয়া তুলিতে পারি। 'গ্রাণ্ট' ত্যাগ করা যায়, বেশী করিয়া কর (ট্যাক্স) বসানোর আবশ্যক হয় না, বালক-দিগকে বিনা খরচায় শিক্ষা দেওয়া যায়, আবার এদিকে স্বরাজ পাওয়ারও একটি বড় উপায় মিলে—ইহা এমনি একটি শক্তিশালী পথ।

ইহাতে যে সকল অসুবিধা আছে আমি তাহার প্রতি অন্ধ নই। ঘরের অসুবিধা একটা বড় অসুবিধা। শহরবাসীরা যেখানে সাহায্য করে সেখানে এই অসুবিধা দূর করা কিছু কঠিন নয়। মহাজনদের বাড়ী, মন্দির, মস্‌জিদ—এ সকল চরখা রাখার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে সকল বাড়ী এখন স্কুল বলিয়া ব্যবহৃত হয় তাহাতে অতগুলি ছেলের চরখা কাটার স্থান হইয়া উঠিবে না। সৌভাগ্যক্রমে চরখার নিশ্বাস-

প্রশ্বাসের বালাই নাই বলিয়া খানিকটা জায়গা জুড়িয়া থাকিলেও তাহা হাওয়া খারাপ না করিয়া ভাল করে। বালকদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা হাওয়ার মতোই কতকটা কম খারাপ হওয়াতে তাহাও ভাল থাকিবে।

আমাদের দেশের মত গরীব দেশে হাতের কাজ শিক্ষার ভিতর আনিয়া ফেলিতে পারিলে দুইটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথমতঃ স্কুলে পড়ার ফী উঠিয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ ছেলেদের ইচ্ছা থাকিলে কিছু উপার্জ্জন করার পথও তাহাদের হাতে দেওয়া যায়। এই প্রকার ব্যবস্থায় আমাদের ছেলেরা স্বাশ্রয়ী হইবে। আমরা যদি মজুরী করিয়া খাওয়াটাকে ধিক্কার দিতে শিখি, তবে তাহার দ্বারাই জন-সাধারণের গুরুতর অনিষ্ট হয়।

হৃদয়ের শিক্ষার বিষয়ে কেবল একটা কথাই বলিব। এই শিক্ষা পুস্তক দ্বারা দেওয়া যায় বলিয়া আমি মনে করি না। শিক্ষকের জীবন্ত সংসর্গ দ্বারাই কেবল ইহা দেওয়া যায়। কিন্তু প্রাথমিক ও মধ্যম পাঠশালায় আমরা কেমন ধারা শিক্ষক দেখিতে পাই? তাঁহারা কি ধর্ম্ম-পরায়ণ ও চরিত্রবান? তাঁহারা নিজেরাই কি হৃদয়ের শিক্ষা পাইয়াছেন? তাঁহাদের হাতে যে সকল বালক-বালিকাকে সমর্পণ করা যায় তাহাদের ভিতর যে স্বাভাবিক শুদ্ধভাব আছে তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন—ইহা কি ধরিয়া লওয়া যায়? প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সব শিক্ষক রাখা হয় তাঁহারা চরিত্রের পক্ষে কি হানিকারক নহেন? শিক্ষক-দের খাওয়া-পরার উপযুক্ত বেতন কি দেওয়া হয়? আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্ব্বাচনের সময় সে

শিক্ষকের দেশ-প্রেম আছে কি না তাহাও দেখা হয় না। যাহার আর কোনও কাজ জোটে না সেই এই শিক্ষকতা লয়।

অবশেষে শিক্ষার বাহনের বিষয় বলিব। এ বিষয়ে আমার অভিমত এতই প্রকাশিত হইয়াছে যে, উহা আবার নূতন করিয়া দেখাইয়া দেওয়ার দরকার নাই। শিক্ষার বাহন বিদেশী ভাষা করায় বালকদের মাথার উপর মিথ্যা বোঝা চাপানো হয়, তাহাদের জ্ঞানের পথ মিছামিছি রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাহারা না বুঝিয়া মুখস্থ করায় ও নকল করায় পটু হয়। তাহারা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে বা বিচার করিতে পারে না। আর যাহা শিক্ষা করে তাহাও পরিবারের ভিতর বা জন-সাধারণের ভিতর বিতরণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পরদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করায় আমাদের নিজের দেশেই ছেলেরা পুরাদস্তুর পরদেশী হইয়া যাইতেছে। শিক্ষা দেওয়ার প্রচলিত প্রথার ইহা বড় একটা সঙ্কট। তাহা ছাড়া পরদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার জন্য আমাদের দেশী ভাষার উন্নতিও আটকাইয়া গিয়াছে।

শিক্ষার বাহন

শিক্ষার বাহন কি হইবে—তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। উহা না করিলে প্রায় অন্য সমস্ত প্রস্তাবই অকেজো হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কি ভাষায় শিক্ষা দিব—তাহা স্থির না করিয়া শিক্ষা দিতে থাকিলে, ভিৎ না গাড়িয়া ইমারত খাড়া করিলে যে পরিণাম হয় তাহাই করা হইয়া থাকে।

শিক্ষার বাহন হিসাবে দেশী ভাষা ব্যবহারের প্রশ্ন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের প্রশ্ন সমূহের অন্যতম। দেশী ভাষার অনাদর করা হইলে রাষ্ট্রকেই আঘাত করা হয়। শিক্ষার বাহন হিসাবে যাঁহারা ইংরেজী ভাষাই চালাইবার পক্ষে তাঁহাদিগকে এই কথাই বলিতে শোনা যায় যে, যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লইয়াছেন সেই হিন্দুরাই প্রজার ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যের রক্ষক। যদি বাস্তবিক তাহাই হয় তবে ত ভয়ঙ্কর কথা। যত সময় আমরা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য দিয়া থাকি সে অনুসারে ফল কিছুই হয় নাই।

পরদেশী ভাষায় শিক্ষা লওয়ায় মাথার উপর যে বোঝা চাপানো হয় তাহা অসহ্য। এই বোঝা আমাদের বালকেরা বহন করিলেও উহার ফল না ফলিয়া যায় না। উহারা অন্য বোঝা বহিতে অসমর্থ হয়। এই জন্যই আমাদের গ্রাজুয়েটদের (বি, এ) বেশীর ভাগই অসার, দুর্ব্বল, নিরুৎসাহী, রোগী ও কেবল নকল-নবিস হয়। তাহাদের বোধ-শক্তি, বিচার-শক্তি, সাহস, ধৈর্য্য, ধীরতা, নির্ভরতা ইত্যাদি গুণ কমিয়া যায়।

সেই জন্য তাহারা নূতন ব্যবস্থা রচনা করিতে পারে না, যদি-বা রচনাও করে তবে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে উৎরাইয়া দিতে পারে না। আবার কতক লোক্ যাহাদের মধ্যে উপরের গুণগুলি দেখা দেয় তাহারা হয় ত অকালে মারা যায়। এই প্রকার পরিণামের কারণ হইতেছে ইংরাজীকে শিক্ষার বাহন করা। নিজের ভাষা আমাদের নিজের প্রতিবিম্বের মত। যদি এ কথা কেহ বলেন যে, আমাদের ভাষা সর্ব্বোত্তম ভাব প্রকাশ করিতে অপারগ তবে আমি বলিব যে, আমাদের ধ্বংস যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। আমাদের ভাষার উপর হইতে আমাদের বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। ঐ প্রকার মনে করা আমাদের নিজেদের উপরই অবিশ্বাসের চিহ্ন। আমাদের অধোগতির উহাই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কেহ কি এ কথা স্বপ্নেও ভাবেন যে, হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রীয় ভাষা কেন ইংরাজী হইবে? প্রজার উপর এই বোঝা কেন চাপানো হইবে? একটু বিচার করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের বালকদিগকে কি সর্ত্তে ইংরাজ বালকদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। এই বিষয়ে কয়েকজন ইউরোপীয় অধ্যাপকের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তাঁহারা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক ভারতীয় যুবককে ইংরাজী ভাষার মারফতে জ্ঞান লাভ করিতে হয় বলিয়া তাহাদের জীবনের খুব কম করিয়া ধরিলেও ছয়টা বৎসর নষ্ট করিতে হয়। আমাদের স্কুল ও কলেজ হইতে যাহারা বাহির হইয়াছে তাঁহাদের সংখ্যাকে এই ছয় দিয়া গুণ কর, তবে জানিবে যে, প্রজার কত হাজার বৎসর লোকসান হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো প্রজারা সাহসী, বলবান ও চরিত্রবান। আমাদের মধ্যে যেমন বাল্যবিবাহ প্রভৃতি ক্রটি আছে তাহা তাহাদের

মধ্যে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের যে অবস্থা তাহাদেরও তাহাই। তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বাহন হইতেছে ডচ্ ভাষা। তাহারাও আমাদের মত ডচ্ ভাষা শিখিয়া ফেলে, আমাদের মত তাহারাও শিক্ষা অন্তে শক্তিহীন হয়, বেশীর ভাগই কেবল নকল করিতে লাগিয়া যায়। দেখা যায়, তাহাদের ভিতরকার আসল জিনিষ তাহাদের মাতৃভাষার সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত আমরা এই লোকসানের ঠিক মাপ করিতেই পারি না। প্রজা-সাধারণের উপর আমরা কত কম প্রভাব বিস্তার করিয়াছি তাহা হিসাব করিলে কতকটা বুঝিতে পারা যাইতে পারে। আমাদের মা-বাপেরা এই শিক্ষার উপর যে মন্তব্য করিয়া থাকেন উহাও বিচারের যোগ্য।.........আমার বিশ্বাস এই যে, যদি আমরা ৫০ বৎসর ধরিয়া আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা লইতাম তাহা হইলে আমরা একটা প্রচণ্ড শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিতাম এবং সে শক্তি দেখিয়া আমরা আজ হয়তো আশ্চর্য্যও হইতাম না।

এখন শিক্ষিতের যে জ্ঞান উহা বিদেশীয় লোকের জ্ঞানের মতই লোকের নিকট অজানা। যদি সকল বিষয়ের শিক্ষাই মাতৃভাষার ভিতর দিয়া দেওয়া হইত তবে এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, তাহাদের বিশ্বাস আশ্চর্য্য-ভাবে গড়িয়া উঠিত। গ্রামের কিসে সুখ হয় ইত্যাদি নানা প্রশ্নের দিকে তাহাদের মন কবে চলিয়া যাইত। আজ তাহা হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি বিশেষ করিয়া জীবন্ত ও গ্রাম সুস্থ হইয়া উঠিত এবং কবে ভারতবর্ষ নিজের অনুকূল স্বরাজ্য ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু এই ভুল শোধরাইবার কথা এখনো আমাদের মাথায় ঢোকে নাই।

মায়ের বুকের দুধের সাথে যে সংস্কার পাওয়া যায়, যে মধুর শব্দ পাওয়া যায়, তাহার সহিত বিদ্যালয়ের যে সংযোগ হওয়া দরকার তাহা পরদেশী ভাষায় হাওয়াতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহারা এই সংযোগ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল সৎ, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা প্রজার শত্রুর কাজ করিয়াছেন। ঐ প্রকার শিক্ষা লইয়া আমরা মাতৃদ্রোহ করিয়াছি। পরদেশী ভাষায় শিক্ষা লওয়ার দোষ এই টুকুতেই শেষ হয় নাই ; তাহার দ্বারা শিক্ষিত শ্রেণী ও জন-সাধারণের মধ্যে একটা ভেদও গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা প্রজাদিগকে চিনি না এবং প্রজারাও আমাদিগকে চিনে না। প্রজা-সাধারণ আমাদিগকে সাহেবদের মধ্যেই গণ্য করিয়া থাকে। আমাদিগকে তাহারা ভয় করে—অবিশ্বাস করে। যদি এই অবস্থা বেশী দিন চলে, তবে শিক্ষিত লোকেরা প্রজাদের প্রতিনিধি নহে বলিয়া লর্ড কার্জ্জন আমাদের উপর যে দোষারোপ একদিন করিয়াছিলেন সেই কথা সত্য হওয়ার সময় আসিবে।

যদি আমরা মাতৃ-ভাষার সাহায্যেই আমাদের শিক্ষা লইতাম তবে ঘরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অন্য রকমের হইত। এখন আমরা স্ত্রীলোকদিগকে ঠিক মত শিক্ষা দিতে পারি না। নিজের শক্তির সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান বড় কম। আমরা যাহা শিখিয়াছি তাহা আমাদের বাপ মাদের কাজে আসে না। আমাদের ধোপা-নাপিত, আমাদের মেথর—ইহাদের সকলকে যদি আমাদের মাতৃভাষার উচ্চ জ্ঞান দিতে হয়, তবে সহজেই তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়। বিলাতে কামাইতে কামাইতে নাপিতের সাথে রাজনীতির আলোচনা হয়। এখানে ত নিজের পরিবারের

মধ্যেই তাহা করিতে পারি না। তাহার কারণ ইহা নয় যে, আমাদের পরিবারের লোকেরা বা আমাদের নাপিতেরা অজ্ঞান। উহারা অজ্ঞান নয়। ঐ ইংরেজ নাপিতের মত জ্ঞান তাহাদেরও আছে। তাহাদের সহিত সহজেই আমরা মহাভারত, রামায়ণ ও তীর্থক্ষেত্রের কথা বলিতে পারি, কেন না প্রজা-শিক্ষার প্রবাহ ঐ দিক দিয়া রহিয়াছে। কিন্তু স্কুলে যাহা পাই তাহা ঘরে লইতে পারি না। যাহা আমরা ইংরাজীর ভিতর দিয়া শিখি তাহা ত পরিবারের লোককে দিতে পারি না।

মাতৃভাষার দ্বারা শিক্ষা দেওয়ায় ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানের হানি হইবে কি না—সে কথা ভাবারই প্রয়োজন নাই। ইংরাজী ভাষার উপর সকল শিক্ষিত ভারতবাসীর দখল রাখার প্রয়োজন নাই। কেবল তাহাই নয়, ঐ ভাষায় দক্ষতা লাভ করার জন্য রুচি উৎপন্ন করারও আবশ্যকতা নাই। আমি নম্র ভাবে এ কথা বলিতেছি।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার জন্য নিম্নলিখিত পথগুলি গ্রহণ করিতে হইবে।

১। যে দেশী ভাইরা ইংরাজী ভাষা জানেন তাঁহারা যেন জানিয়া না জানিয়া পরস্পরের সহিত কথা-বার্ত্তায় ইংরাজী শব্দের প্রয়োগ না করেন।

২। যাঁহাদের ইংরাজী ও দেশী উভয় ভাষারই ভাল জ্ঞান আছে তাঁহারা ইংরাজী ভাষায় যে সকল ভাল পুস্তক আছে সেগুলি দেশী ভাষায় তর্জ্জমা করিবেন।

৩। পাঠ্য-পুস্তক যাহাতে দেশী ভাষায় লেখা হয় সে চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। যখন কোনও চাকুরীতে কাহাকেও লওয়া হয় তখন ইংরাজী যে জানে তাহাকেই আগে স্থান দেওয়া হয়। উহা বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। যদি কেবল দেশী ভাষা জানা লোক তাঁহার কাজের যোগ্য হয়, তবে কোনও ভেদ না রাখিয়া তাহাকেই পছন্দ করিতে হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, দেশের উন্নতির ভিত্তি শিক্ষার বাহন শুদ্ধ রূপে নির্ণয় করার উপর নির্ভর করে। সেই জন্যই আমার প্রস্তাব আমার নিকট গভীর অর্থ-পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। যদি মাতৃভাষার মূল্য বাড়ে, যদি সে রাষ্ট্র-পদ পায়, তবে উহা হইতে এমন শক্তি আসিবে যাহা আমাদের কল্পনাতীত।

কোনও স্বাধীন রাজার যে ক্ষমতা আছে আমার যদি তাহা থাকিত তাহা হইলে আমাদের ছেলে-মেয়েকে পরদেশী ভাষা দ্বারা শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতাম এবং চাকুরী ছাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়া শিক্ষক ও অধ্যাপকদের দ্বারা এই পরিবর্ত্তন তখনকার তখনই করাইয়া লইতাম। কবে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক দেশী ভাষায় তৈয়ারী হইবে সে পথ চাহিয়া বিলম্ব করিতাম না। পরিবর্ত্তন করার পর পাঠ্য-পুস্তক গড়িয়া উঠিবে। এই সঙ্কটে অবিলম্বেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

পরদেশী ভাষায় শিক্ষা দিতে যে আমার একান্ত অনিচ্ছা—সে কথা আমি কিছু রাখিয়া-ঢাকিয়া বলি নাই, আর তাহার ফলে এই হইয়াছে যে, আমার বিরুদ্ধে একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। বলা হয় যে,

আমি পাশ্চাত্য সভ্যতার ও ইংরেজী সাহিত্যের শত্রু। আমি ইংরাজী ভাষাকে ভিন্ন জাতির সহিত ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ভাষা বলিয়া গণ্য করি। সেই জন্যই আমি মনে করি যে, আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ইংরাজী-জ্ঞান থাকা চাই। ইংরাজীতে কতকগুলি ভাল ভাল ভাব-ধারা ও সাহিত্যিক সম্পদ আছে। সেই জন্য যাঁহারা ভাষা-শাস্ত্রে কুশল তাঁহারা যাহাতে উক্ত ভাষা মন দিয়া অভ্যাস করেন সেজন্য অবশ্যই আমি তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিব। এই সকল সম্পদ তাঁহারা দেশী ভাষায় ভাষান্তরিত করিবেন—এ আশাও আমি রাখি।

আমরা অশিক্ষিত হইয়া পড়ি বা আমাদের শিক্ষার সাম্‌নে কোনও অন্তরাল আসিয়া দাঁড়ায়—ইহা আমার যতটা অনভিপ্রেত তত আর কিছুই নয়। তবে এ কথাও আমি বিনয়ের সহিত বলিতে চাই যে, নিজের সভ্যতাকে আদর দেওয়ার পরে এবং তাহা পরিপাক করার পরেই অপরের সভ্যতার আদর উপযুক্ত ভাবে হইতে পারে—তাহার পূর্ব্বে নয়। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের সভ্যতায় যেমন সমৃদ্ধি ও সম্পদ আছে অন্য কোনও সভ্যতায় তত নাই। আমাদের এই সম্পদ আমরা জানিতেও পারি না। আমাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে এই সভ্যতার মূল্য খুবই কম ধরা হয় এবং পিছন হইতে উহাকে নিন্দা করিতেই শিখানো হয়। আমাদের সভ্যতার ধারা অনুযায়ী জীবন যাপন করা আমরা এক প্রকার ত্যাগই করিয়াছি। বিদ্যালয় হইতে চরিত্রের সম্পদ-শূন্য যে জ্ঞান দেওয়া হয় তাহা সুগন্ধিতে ঢাকা, মরার শরীরের মত বাহ্যিক মোহকারী, তাহার অন্তরালে উৎসাহ দান-কারী, উন্নতি-দান-কারী জীবন নাই। আমার ধর্ম্ম আমাকে আমাদেরই সভ্যতা গ্রহণ করিতে ও সেই

অনুসারে জীবন যাপন করিতে আগ্রহের সহিত বলে। সেরূপ আচরণ না করায় সমাজকে আহত করা হয়। আবার আমার সেই ধর্ম্মই অপর সভ্যতাকেও কম মূল্য দিতে বা অবহেলা করিতে নিষেধ করে।

শিক্ষা

কেহ স্বরাজ পাওয়ার যোগ্য কি না—একথা যেমন স্বরাজ পাইয়াই প্রমাণ করিতে হয়, তেমনি উহা রক্ষা করার শক্তির দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হয়। বাহিরের আক্রমণ সত্ত্বেও যে টিকিয়া থাকিতে পারে তাহাকেই আমরা শক্তি-মান বলিয়া থাকি। বাহিরের প্রাণীর আক্রমণ সত্ত্বেও যে সুস্থ থাকিতে পারে তাহার শরীর ভাল বলা যায়। এই লড়াইয়ের কেন্দ্র-স্থল হইতেছে শিক্ষা। অন্য বিষয়ে শহরবাসীরা তাঁহাদের অধিকার বজায় রাখুন বা না-রাখুন, কিন্তু যদি শিক্ষার বিষয়ে হারিয়া যান তবে একেবারেই হারিয়া গিয়াছেন বলিতে হয়। শিক্ষায় হারিয়া গেলে তাহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শহরবাসীরা স্বাধীন ভাবে বিচার ও কার্য্য করিতে জানেন না। শহর-বাসীদের কর্ত্তব্য—নিজেদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে নিজেদের হাতে রাখা। কেবল এই টুকুই নয়, শিক্ষাকে এমন সুন্দর ভিত্তির উপর স্থাপিত করা উচিত যে, সরকারের স্কুলে যাওয়ার লালসাই আর না হয়।

এই কাজ করিতে গিয়া দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে যতটুকু কৃত্রিম ততটুকুই চলিবে না। শহরবাসীরা যদি খাঁটি অসহযোগী হইতেন তবে নিজেদের ছেলেদিগকে সরকারী স্কুলে পাঠাইতেন না। যদি ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়ার গরজ তাঁহাদের থাকিত, তবে শিক্ষাটা ভাল ভিত্তির উপরেই তাঁহারা স্থাপিত করিতেন—শিক্ষিত লোকেরা শিক্ষা দেওয়ার সহায়ক হইতেন, শহর-বাসীরা বিদ্যা-স্থানের জন্য জায়গা দিতেন, যে সকল সুবিধার

দরকার তাহা করিয়া দিতেন ও সরকারকে দেখাইয়া দিতেন যে, নিজেদের ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁহারা অনেক কষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই শিক্ষার কথায় প্রয়োজনীয় টাকার কথাটা আসিয়া পড়ে। আমার ত দৃঢ় মত এই যে, যদি শিক্ষার জন্য কর দিতে হয় তবে শহরবাসী তাহা দিতে অস্বীকারই করিবেন। কিন্তু কর থাকুক বা না-ই থাকুক, শহরবাসীদের উপর তত অর্থ একত্র করার ভার পড়াও উচিত নয়। যতটা অর্থ আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা নিজেদের একতা ও দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে পারেন। যে টাকা তাঁহারা শিক্ষায় দিবেন তাহা দান নয়, তাহা টাকাকে মূলধন করিয়া রাখার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। বাপ-মায়েদের পক্ষে তাহা পুরা লাভ পাওয়ার মতই ক্ষেত্র।

যেখানেই তাকাই না কেন, সেইখানেই কাঁচা ভিতের উপর ভারি ইমারত উঠানো হইয়াছে দেখিতে পাই। প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদিগকে বিনয়ের খাতিরে শিক্ষক বলিতে হয় বলুন, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা-দিগকে শিক্ষক বলিয়া তাঁহারা 'শিক্ষক' শব্দের অপব্যবহারই করিয়াছেন।

দেশের বিদ্যা-দান কার্য্য যতদিন পর্য্যন্ত চরিত্রবান শিক্ষক দ্বারা না দেওয়া হয় ততদিন দরিদ্রতম ভারতবাসীর নিকট শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা পঁহুছানোও সম্ভব নয়। যতদিন পর্য্যন্ত বিদ্যা ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সঙ্গম না হয়, যতদিন বিদ্যাকে ভারতবর্ষের অবস্থার সহিত যোগ-যুক্ত না করা হয়, যতদিন পর্য্যন্ত পরদেশী ভাষায় শিক্ষা দিয়া বালক ও যুবকদের উপর অসহ্য বোঝা চাপানো হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রজার জীবন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে না—একথা নিশ্চয় বলা যায়।

শুদ্ধ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ত নিজ নিজ প্রদেশের ভাষার ভিতর দিয়াই হওয়া দরকার। যেখানে বিদ্যার্থীরা নির্ম্মল জল-বায়ু পাইতে পারে, যেখানে শান্তি পাওয়া যায়, যেখানে বাড়ীর ও আশ-পাশের জমি স্বাস্থ্যের দিক হইতে দৃষ্টান্ত-স্থল হইতে পারে, এমন স্থানেই বিদ্যালয় বসানো কর্ত্তব্য এবং যাহাতে ভারতবর্ষের প্রধান কর্ম্ম-চেষ্টার ও প্রধান ধর্ম্মগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান পাওয়া যায়—শিক্ষা-পদ্ধতি তেমনি হওয়া আবশ্যক।

বিদ্যার্থীদের নিকট বাল্যকালটাই একটা বিশেষ সময়। এই সময় যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহা কখনও ভোলা যায় না। কিন্তু এই সময়টাতেই ছেলেরা এখানে সব চাইতে কম জিনিষ পায়, যেমন-তেমন কাজ-চালানো গোছের একটা স্কুলে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

স্কুলের ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যে, ছেলেরা যেন না ঘোরা-ফেরা করে; তাহারা যেন চরিত্রবান শিক্ষকের নিকট চরিত্র গড়িয়া লইতে পারে। হিন্দু বালক-বালিকারা সংস্কৃত শিখিবে ও গীতা পড়িবে। মুসলমান ছেলেদের আরবী শেখা চাই ও কোরান পড়া চাই। তাহা ছাড়া সকলেরই সুন্দর, মজবুত, এক সমান সুতাকাটা চাই, এবং তাহার উপর তুলা ধুনিতে ও তাঁতও বুনিতে পারা চাই।

আমার বক্তব্য এই যে, এই গরীব দেশের লোক যে-টাকা খরচ করার ভার পাইতে পারে না, সেই টাকা লইয়া শোভা-স্বরূপ স্কুল-কলেজ না করিয়া যদি সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে সুশিক্ষিত চরিত্রবান শিক্ষকের হাতে শিক্ষার ভার দেওয়া যায় তবে অল্প সময়েই আমরা এই মহৎ কার্য্যের চমৎকার ফল দেখিতে পাইব। যদি এই প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া শিক্ষককে প্রচলিত বেতনের দ্বিগুণ বেতনও দিতে হয় তবুও উদ্দেশ্য ত্যাগ

করিতে নাই। বড় ফল পাইতে হইলে সামান্য পরিবর্ত্তনে তাহা হইবে না, প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপই বদলাইয়া ফেলা চাই।

ভারতবর্ষে দানের শক্তি ভালই আছে। পয়সার অভাবে কোনও ভাল চেষ্টা ঠেকিয়া থাকে না। ঠেকিয়া থাকে মানুষের অভাবে, অধ্যাপক বা প্রধানের অভাবে, আর যদি প্রধান শিক্ষকও পাওয়া যায় তবে গিয়া ঠেকে শিষ্যের বা সিপাহীর অভাবে। আমি জানি—যেখানে নেতা উপযুক্ত সেখানে সিপাহী পাওয়াই যায়। ছুতারের যন্ত্র যতই ভোঁতা হউক না কেন, ছুতার যন্ত্রের সাথে ঝগড়া করে না, অত্যন্ত ভোঁতা যন্ত্র দিয়াও সে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। প্রধান যদি উপযুক্ত কারিগর হয় তবে যে জিনিষই পাওয়া যাউক, তাহার দ্বারা এই দেশের মাটি হইতেই সে সোনা ফলাইতে পারে।

আমার বোধ হয়, আমেরিকার নিকট হইতে আমাদের অল্পই শিখিবার আছে। কিন্তু সেখানকার একটা জিনিষ অনুকরণ করার যোগ্য। তাহাদের শিক্ষার মহান্ সংস্থাগুলি একটা ট্রাষ্ট দ্বারা পরিচালিত। উহাতে সেখানকার ধনবানেরা কোটি কোটি টাকা দিয়াছে। সেই ট্রাষ্টের হাত দিয়া অনেক প্রাইভেট স্কুলও চলে। উহাতে যেমন ধন সংগৃহীত হইয়াছে তেমনি স্বাস্থ্যশালী, স্বদেশাভিমানী বিদ্বান গৃহস্থও উহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই সমস্ত সংস্থার খোঁজ-খবর করেন, পরীক্ষা করেন ও রক্ষণ করেন। তাঁহারা যেখানে ভাল মনে করেন সেখানে সম্ভব মত সাহায্য করেন। যাহারা সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলিতে চায় এমন সমস্ত সংস্থাই এই সাহায্য পাইতে পারে। এই ট্রাষ্টের জন্য আমেরিকার চাষারা চাষের সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান পাইতেছে।

এই প্রকারের কোনও ব্যবস্থা গুজরাটেও হইতে পারে। গুজরাটে ধন আছে, বিদ্যা আছে, ধর্ম্ম-বৃত্তিও এখন পর্য্যন্ত লোপ পায় নাই। বালকেরা ত বিদ্যার পথই খুঁজিতেছে। এই প্রকার ট্রাষ্ট-স্থাপনায় শিক্ষা-প্রচারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে এবং শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব হইবে।

এই কার্য্য যদি হয় তবে আর সকলই হইল বলা যায়। কিন্তু সহজে এ জিনিষ হওয়ার নয়। এই প্রতিষ্ঠায় যেমন সরকার তেমনি ধনীরা এই শত্রুতার প্রতিকার করিবেন, জাগ্রতিও তাহাতেই হইবে। এদিকে প্রতিষ্ঠাতাদের শত্রুতা করার একটা মাত্র উপায়ই আছে—সে উপায় হইতেছে তপশ্চর্য্যা। তপশ্চর্য্যা ধর্ম্মের প্রথম ও শেষ পদ। যেখানে পরোপকার-বৃত্তি বাস করিবে এবং উহাই যেখানে বিদ্যা বলিয়া গণ্য হইবে সেখানে নিজের ইচ্ছাতেই লক্ষ্মী আসিয়া পড়িবেন। ধনীরা সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ। তাহাদের সন্দিগ্ধ হওয়ার কারণও আছে। আমরা যদি লক্ষ্মীর আরাধনা করিতে চাই তবে তাহার যোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইবে।

অনেক টাকার আবশ্যক থাকিলেও উহার উপর জোর দিতে চাই না। যাহার নিকট রাষ্ট্রীয় শিক্ষা দেওয়া আরাধ্য বস্তু হইয়াছে, সে যদি মজুরী করিতে না শিখিয়া থাকে তবে এখন শিখিবে, শিখিয়া এক গাছের নীচে বসিয়া যাহাকে বিদ্যাদান করিতে হয় তাহাকে তাহা দিতে থাকিবে। ইহাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ইহা আচরণ করিতে যাহার ইচ্ছা হয় সে তাহা করিতে পারে। এই প্রকার ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলেই লক্ষ্মী ও সত্তা দুই-ই আসিয়া নমস্কার করিবে।

বৈষ্ণব মন্দিরে, জৈন মন্দিরে ও প্রভু নারায়ণের মন্দিরে কোটি কোটি টাকা আবর্জ্জনার মত হইয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে যদি সামান্য

অংশও পাওয়া যায় তবে তোমাদের সমস্ত শিক্ষা বিভাগের ব্যয় চলে। কিন্তু সরকার যেমন পয়সা উড়াইতে উড়াইতে দশ মিনিটেই সমস্তটা শেষ করিয়া থাকেন আমরা তেমন ত উড়াইতে চাই না। আমাদের কার্য্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের অনুযায়ীই হইবে। যাদু-বিদ্যাতে এক ঘণ্টাতেই গাছ হইতে আম তৈয়ার করা যায়, কিন্তু সে আমের স্বাদ আমরা চাখিতে পারি না। সত্য আম গাছে আম হইতে অনেক বৎসর লাগে। তেমনি যদি কেহ রাষ্ট্রীয় শিক্ষার জন্য আজ কোটি টাকাও দেয় তবে আমি বলিব—"উহা ফেলিয়া দাও।" খালসা কলেজের প্রফেসারেরা বলিয়াছিলেন—"যদি গান্ধী এক কোটি টাকার 'গ্রাণ্ট' দেন তবে অসহযোগ করিব।" তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"আমরা সরকারের গোলামী ছাড়িয়া গান্ধীর গোলাম হইতে চাই না। আমরা কলেজ রাখার জন্য দলে দলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিখদের নিকট হইতে ভিক্ষা তুলিব।" সেই প্রফেসরেরাই আবার কলেজকে নোটিশ দেন যে, যদি সরকারী কর্ত্তৃত্ব কলেজ হইতে না চলিয়া যায় তবে তাঁহারা ফকীর হইয়া যাইবেন ও দেশের বালকদিগকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা দিবেন। যদি তোমাদের ভিতর শ্রদ্ধা থাকে ত যতটা পার ও যাহাতে লজ্জা না পাইতে হয় তেমনি ভাবে দান করিয়া যাও।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষার প্রচারের কাজটা অনেক অংশেই বাপ-মায়ের হাতে। সত্যকার লোক-শিক্ষা পুঁথি পড়ায় হয় না, হয় চরিত্র দ্বারা, হাতে-পায়ের চেষ্টায় ও শরীরের মেহনত দ্বারা। গুজরাটের বাপ-মায়ের পুঁথি-পড়া-বিদ্যার মোহ যায় নাই। তাঁহারা এখনও ঐ বিদ্যার স্বরূপটা দেখিতে পান নাই। তাঁহারা এখনও স্বীকার করেন না যে, বালক-দিগকে প্রথমেই নীতি-শিক্ষা দিতে হয়, তাহার পর দিতে হয় শরীরকে

তৈয়ার করার শিক্ষা, তাহার পরে জীবিকা উপার্জ্জনের সাধন হিসাবে কোনও কলা-শিক্ষা দিতে হয় এবং তাহার পর দিতে হয় তাহাদের মনের বিকাশের শিক্ষা। সর্ব্বশেষে অলঙ্কার হিসাবে তাহাদিগকে পুঁথি-পড়া-জ্ঞানে শোভিত করা দরকার।

স্ত্রীলোকদের ইংরাজী শিক্ষা

স্ত্রীলোকদের ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না এ বিষয়ে দুই-চার কথা বলা দরকার। আমার ত মনে হয় যে, আমাদের সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ—এই উভয়ের একেরও ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যক নাই। রোজগারের জন্য, অথবা রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য পুরুষের ইংরাজী জানার আবশ্যক হইতে পারে। স্ত্রীলোকদের চাকুরী খোঁজার বা ব্যবসা করার দুর্ভাগ্যের প্রয়োজন আছে—এ কথা আমি মানি না। সেই জন্য ইংরাজী ভাষার জ্ঞান কেবল অল্প সংখ্যক স্ত্রীলোকেরই দরকার হইতে পারে এবং তাঁহারা পুরুষের জন্য যে সব বিদ্যালয় আছে সেখানেই উহা শিখিতে পারেন।

যদি স্ত্রীলোকদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিতে আমরা ইংরাজী ভাষা প্রবেশ করাই তবে উহা আমাদের পরাধীনতার কাল বাড়াইবারই কারণ হইবে। আমি এ কথা অনেক জায়গায় শুনিয়াছি ও অনেক জায়গায় পড়িয়াছি যে, ইংরাজী ভাষায় যে সকল সম্পদ আছে তাহা যেমন পুরুষদের পাওয়া চাই, তেমনি স্ত্রীলোকদেরও পাওয়া চাই। আমি নম্রতার সহিত বলিতেছি যে, ইহাতে কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। পুরুষেরাই ইংরাজী ভাষা হইতে সম্পদ লইবে, স্ত্রীলোকেরা লইবে না—এ কথা ত কেহ বলিতেছে না। যাহার সাহিত্যের সখ আছে সে যদি সারা দুনিয়ার সাহিত্য বুঝিতে চায় তবে তাহাকে কেহ এ জগতে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু জন-সাধারণের আবশ্যক বুঝিয়া যেখানে শিক্ষার ক্রম ধার্য্য করা হইয়াছে সেখানে উপরোক্ত সাহিত্য-প্রেমিকের জন্য ব্যবস্থা

করা যায় না। তাহাদের জন্য আমাদের উন্নতির কালে, যেমন ইউরোপে আছে সেই রকম আলাদা আলাদা সংস্থা থাকিতে পারে।

যখন সুব্যবস্থিত ভাবে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা লইতে থাকিবে, যখন অশিক্ষিত থাকা অপবাদ বলিয়া গণ্য হইবে, তখন অন্য ভাষার সাহিত্যের রস আমাদিগকে দেওয়ার জন্য দলে দলে লেখক জুটিবে।

যদি আমরা সর্ব্বদা ইংরাজী ভাষা হইতেই সাহিত্য-রস লইতে থাকি, তবে আমাদের ভাষাও চিরকালই দুর্ব্বল থাকিয়া যাইবে, অর্থাৎ আমরাও চিরকালই দুর্ব্বল থাকিয়া যাইব। পরের ভাষার সাহিত্য হইতে আনন্দ লওয়ার অভ্যাসটার একটা তুলনা আমি দিতে চাই যদি সে তুলনা দেওয়ার জন্য আপনারা আমাকে মাফ করেন। তুলনাটি হইতেছে এই—উহা চোরাই মাল পাইয়া চোরের আনন্দ পাওয়ার মত।

ইংরাজীর জন্য যে অন্যায় মোহ আপনাদের রহিয়া গিয়াছে তাহা আপনারা ত্যাগ করুন। নিজেদের সম্বন্ধে ও নিজেদের ভাষার সম্বন্ধে আপনাদের মনে যে অবিশ্বাস আছে তাহা যদি ত্যাগ করিতে পারেন, তবে দেখিবেন—ইংরাজী ভাষা ত্যাগ করায় মোটেই মুস্কিল নাই। আমি যখন বলি—স্ত্রী বা পুরুষ ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য যেন সময় না দেয়, তখন তাহা তাহাদের আনন্দ কমাইবার জন্য বলি না—বরঞ্চ, যে আনন্দ ইংরাজী অভিজ্ঞেরা অতি কষ্টে পায় তাহাই তাহারা যাহাতে সহজে পাইতে পারে, সেই জন্যই বলি। পৃথিবী অমূল্য রত্নে ভরিয়া আছে। ইংরাজী ভাষাতেই সমস্ত সাহিত্য-রত্ন নাই। অন্য ভাষাও রত্নে ভরপূর। সে সকলও ত আমাদের জন-সাধারণের জন্য আমরা চাই। উহা লাভ করার কেবল একটা মাত্র রাস্তাই আছে। সে রাস্তা হইতেছে—

আমাদের মধ্যে যাঁহাদের যোগ্যতা আছে তাঁহারা নানা ভাষা শিখিয়া রত্নগুলি নিজ ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া আমাদিগকে উপহার দিবেন।

আজকাল লোকে যে ইংরাজী শিখে তাহা ব্যবসায়ী বুদ্ধি ও তথাকথিত রাজনৈতিক লাভের জন্যই শিখে। আমাদের বিদ্যার্থীরা এই কথাই বিশ্বাস করে যে, ইংরাজী না হইলে তাহাদের সরকারী চাকুরী মিলিবে না—কথাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আর মেয়েদিগকে যে ইংরাজী শিখানো হয় তাহার হেতু হইতেছে—ইংরাজী শিখিলে ভাল বর পাওয়া যায়। আমি এমন কত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি যেখানে ইংরাজের সহিত ইংরাজীতে কথা কহিতে পারিবে বলিয়াই অনেকে স্ত্রীকে ইংরাজী শিখাইতে চায়। আমি এমন কত স্বামী দেখিয়াছি যাহাদের এই দুঃখ রাহিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের স্ত্রী তাহাদের সহিত বা তাহাদের বন্ধুদের সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতে পারে না। আমি এমন পরিবারও জানি যেখানে ইংরাজী ভাষাকেই নিজের ভাষা বলিয়া চালানো হইয়া থাকে। শত শত নব্য যুবক মনে করে যে, ইংরাজী না জানিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব। সমাজে এই দোষ এমন করিয়াই ঢুকিয়াছে যে, শিক্ষা মানেই আজ ইংরাজী ভাষা-জ্ঞান। এ সকলই আমাদের গোলামীর ও আমাদের অধঃপতনের স্পষ্ট চিহ্ন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আজ যে ভাবে আমাদের নিজেদের ভাষাকে উপেক্ষা করা হইতেছে, যে ভাবে তাহাকে খোরাক হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে—তাহা আমি একেবারেই সহ্য করিতে পারি না। মা-বাপ যখন নিজের ছেলেদের কাছে ও স্বামী নিজের স্ত্রীর কাছে নিজের ভাষা ছাড়িয়া ইংরাজীতে পত্র লেখে তখন তাহা আমি কেমন করিয়া ক্ষমা করিতে পারি?

আমি চাতক পাখীর স্বাধীনতায় মুগ্ধ হই। আমার খোলা হাওয়ার উপর শ্রদ্ধা আছে। আমি ইহাও ইচ্ছা করি না যে, আমার গৃহের চারদিক উচ্চ দেওয়াল দিয়া ঢাকা থাকে ও সেই গৃহের জানালা-দরজা সমস্ত বন্ধ করিয়া রাখা হয়। আমিও ইচ্ছা করি যে, আমার ঘরের আশ-পাশ দিয়া যেন বিদেশের সভ্যতার বাতাসও বয়। কিন্তু আমি ইহা ইচ্ছা করি না যে, সেই বাতাস আমার পা মাটি হইতে ঠেলিয়া তুলিয়া আমাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়। আমি পরের ঘরে আগন্তুক, ভিখারী অথবা গোলাম হইয়া থাকিতে রাজী নই। মিথ্যা অভিমানের বশে অথবা তথা-কথিত সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের খাতিরে আমি আমার ভগ্নীদের উপর ইংরাজী বিদ্যার মিথ্যা বোঝা চাপাইতে চাই না। আমাদের দেশের যে সব যুবক-যুবতীর সাহিত্য-রস ভাল লাগে তাঁহারা দুনিয়ার অন্য ভাষার মত ইংরাজী ভাষাও শিখিয়া লউন—এ ইচ্ছা আমি করি। আর তাহার সাথে সাথে এ আশাও রাখি যে, তাঁহারা ইংরাজী ভাষা হইতে যে সম্পদ পাইবেন তাহা ডাক্তার বোস, ডাক্তার রায় ও কবি শ্রী রবীন্দ্রনাথের মতই ভারতবর্ষকে ও দুনিয়াকে দান করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের একজন লোকও যদি নিজের মাতৃ-ভাষা ভুলিয়া যায়, উহা উপহাস করে বা ভাবে যে, নিজের সর্ব্বোত্তম বিচার সমূহ নিজের ভাষায় দেওয়া যায় না, তবে আমার তাহা বরদাস্ত হয় না। আমি ত বাঁধা-ধরা ধর্ম্ম মানিই না, আমার ধর্ম্মে যেমন ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র বস্তুর স্থান আছে, আবার তেমনি তাহাতে জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ও রংয়ের গর্ব্বের স্থান একেবারেই নাই।

ছাত্রদের প্রতি উপদেশ

ছাত্র অবস্থা সন্ন্যাসের অবস্থারই মত। সেই জন্যই ছাত্রাবস্থা পবিত্র ও ব্রহ্মচারীর যোগ্য হওয়া চাই। এখন প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই সভ্যতার ভিতর প্রতিযোগিতা চলিতেছে। ছাত্রেরা কোনটিকে বরণ করিবে? প্রাচীন সভ্যতায় সংযমই প্রধান স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন সভ্যতা আমাদিগকে বলে—মানুষ যতই জ্ঞান-পূর্ব্বক নিজের অভাব কমাইতে থাকে ততই সে নিজের উন্নতি করিতে থাকে। আধুনিক সভ্যতা শিক্ষা দেয়—অভাব বাড়াইলেই উন্নতি করিতে পারা যায়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে যে পার্থক্য, সংযম ও অসংযমের মধ্যেও সেই পার্থক্য আছে। সংযমে বাহ্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা আন্তর প্রবৃত্তির স্থানই শ্রেষ্ঠ। আজকাল সংযম-ময় প্রাচীন সভ্যতার বদলে স্বেচ্ছাচার-ময় আধুনিক সভ্যতা গ্রহণের আশঙ্কাই তোমাদের বেশী। এই ভয় দূর করিতে ছাত্রেরা খুব সাহায্য করিতে পারে। ছাত্রদের পরীক্ষা তাহাদের জ্ঞান দিয়া হয় না—তাহাদের ধর্ম্মাচরণ দিয়া হয়। এই যুগে ধর্ম্ম-উপদেশ ও ধর্ম্মাচরণকেই প্রধান স্থান দেওয়া চাই এবং সেজন্য ছাত্রদের পুরা সাহায্য আবশ্যক।

আমার ইচ্ছা হয় যে, তোমরা লোকের দোষ অপেক্ষা গুণের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিবে। আমারা ত সকলেই দোষে ভরিয়া আছি। সেই জন্যই লোকের গুণ খুঁজিয়া উহারই মনন করিবে। এইরূপ অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য।

*   *   *   *

আমরা আমাদের ধর্ম্মকে নিজেদের কাজের দ্বারাই বিপদে ফেলিয়াছি। অস্পৃশ্যতা হিন্দু-ধর্ম্মের উপর এমন এক কালো দাগ ফেলিয়াছে যে, উহা উঠাইয়া ফেলিতে পারা যাইতেছে না। এই অস্পৃশ্যতা যে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—এ কথা আমি অস্বীকার করি। আমি জানি যে, আমাদের জীবন-চক্রে যখন আমরা অতি নীচ অবস্থায় পড়িয়াছিলাম সেই সময়ই অস্পৃশ্যতার এই ঘৃণ্য নীচ বন্ধনকারী ভাবনা আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই দোষ আজ পর্য্যন্তও আমাদিগকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। উহা আমার কাছে একটা অভিশাপের মত বোধ হয়। যে পর্য্যন্ত এই অভিশাপ আমাদের উপর থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমাদের এই কথাই মনে করা চাই যে, অস্পৃশ্যতা রূপ ক্ষমার অযোগ্য যে পাপ আমরা করিয়াছি তাহারই শাস্তি স্বরূপ আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে যত দুঃখ আসিয়া পড়িয়াছে।

কোনও লোককে তাহার বৃত্তি বা ব্যবসার জন্য অস্পৃশ্য বলিয়া ধরা যে কেন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ছাত্রদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে, তোমরা ত সকল আধুনিক শিক্ষাই পাইয়াছ তাহা সত্ত্বেও তোমরা যদি এই পাপের ভাগী হও তবে তাহা অপেক্ষা তোমাদের কোনও প্রকার শিক্ষা না পাওয়াই ভাল ছিল।

অবশ্য ইহাতে অল্প-বিস্তর মুস্কিলও আছে। তোমরা হয়ত নিজেরা মনে কর যে, জগতে কোনও লোক এমন থাকিতে পারে না যাহাকে অস্পৃশ্য মনে করা উচিত। তাহা হইলেও তোমাদের পরিবারের উপর তোমরা তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পার না। তোমরা তোমাদের আশ-পাশে তেমন ছাপ আঁকিয়া দিতে পার না। ইহার কারণ—তোমাদের জ্ঞান বিদেশী ভাষার

ভিতর দিয়া আসিয়াছে—আর তোমাদের সমস্ত শক্তি উহাতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই ত তোমাদের শিক্ষা মাতৃ-ভাষার সাহায্যেই হওয়া চাই।

* * * *

ভারতবর্ষের প্রত্যেক বাড়ীই একটা করিয়া বিদ্যা-পীঠ, একটা করিয়া মহা-বিদ্যালয়। আর মা-বাপ হইতেছেন সেখানকার আচার্য্য। মাতা-পিতা এই আচার্য্যের কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। বাহিরের সভ্যতা বা সংস্কারের আমরা পরিচয় লই না, উহার দোষ-গুণের মাপ আমরা লইতে পারি নাই—উহা কেবল মুখস্ত করিয়া লইয়াছি। কিন্তু মুখস্থ করা জিনিষ আমাদিগকে কিছুই দিতে পারে না। সেই জন্যই যেন মনে হয়—ঐ সংস্কারকে আমরা চুরি করিয়া লইয়াছি। এই চোরাই সভ্যতা দ্বারা কি ভারতবর্ষ কখনও উচু হইতে পারে?

* * * *

যে বিদ্যার দ্বারা ধর্ম্ম পালন করা যায় তাহাই বিদ্যা। "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"—যাহা দ্বারা মুক্তি পাওয়া যায় তাহাই বিদ্যা—এই সূত্রটি আমার কাছে বড় ভাল লাগে। মুক্তি দুই প্রকারের—এক হইতেছে দেশকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করা, উহা সাময়িক, অল্প কালের মধ্যেই হইতে পারে। অন্য মুক্তি চিরকালের জন্য। মোক্ষ অথবা পরম ধর্ম্ম যদি পাইতে

হয় তবে পার্থিব মুক্তি ত পাওয়াই চাই। যে লোক অনেক ভয়ের ভিতর বাস করে সে স্থায়ী মুক্তি পাইতে পারে না। যদি স্থায়ী মোক্ষ বা পরম পুরুষার্থ পাইতে হয় তবে হাতের কাছের যে মুক্তি (স্বাধীনতা) তাহা পাইলেই তবে না ছুটি। যে বিদ্যা দ্বারা আমাদের মুক্তি দূরে যায়, সে বিদ্যা ত্যাজ্য, সে বিদ্যা রাক্ষসী, সে বিদ্যা অধর্ম্ম্য।

* * * *

ছাত্রেরা বাপ-মার প্রতি কেমন ব্যবহার করিবে, তাহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে কি না—সেই বিষয়ে এখানে বলিতেছি। তোমাদের পরম ধর্ম্ম হইতেছে তাঁহাদের আজ্ঞা সুন্দর রূপে পালন করা। জ্যেষ্ঠদিগকে পূজনীয় জানিয়া তাহাদের কথার মান রাখা ছাত্রদের ধর্ম্ম—এ কথার ভিতর ভুল নাই। যে মান দিতে জানে না সে মান পায় না। ধৃষ্টতা ছাত্রদের লজ্জার কারণ। ভারতবর্ষে কিন্তু এখন একটা বিচিত্র অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। জ্যেষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠত্ব যেন ছাড়িয়া দিয়াছে, অথবা তাঁহারা নিজেদের মর্য্যাদা বুঝিতেছেন না। সে অবস্থায় ছাত্রেরা কি করিবে? ছাত্রদের ধর্ম্ম-বৃত্তি থাকা চাই—এ কথা আমি ধরিয়াই লইয়াছি। যে ছাত্র ধর্ম্মাচরণ করিতে চায়, তাহার সম্মুখে যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঙ্কট উপস্থিত হয় তখন তাহার প্রহ্লাদকে স্মরণ করা উচিত। প্রহ্লাদ যে সময় যে অবস্থায় নিজের পিতার আজ্ঞা বহু সম্মানের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সেই অবস্থায় আমরাও সেই প্রকার জ্যেষ্ঠের কথা সসম্মানে রাখিতে অস্বীকার করিতে পারি। জ্যেষ্ঠদিগকে অপমান করিলে প্রজার নাশ হয়। কিন্তু এই বড় বলিতে

কেবল বয়স দেখিলেই চলিবে না, পরন্তু বয়সের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সহিত জ্ঞান ও বুদ্ধির জ্যেষ্ঠত্বই দেখিতে হইবে। যেখানে এই তিন বস্তুর অভাব সেখানে কেবল বয়স দ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব হয় না। কেবল বয়সকে কেহ পূজা করে না।

যাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র তাঁহাদের নিকট মনকে এতটুকুও গোপন রাখিতে নাই, অথবা নিজের ভিতর যাহা নাই তাহা আছে—এই বিশ্বাস করাইয়া দিতে নাই। ঐ রূপ করিলে কখনও যে আমাদের ভাল হইবে না—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি মা-বাপকে ভক্তি করিতাম, শ্রবণ যেমন ভক্তি করিত তেমনি ভক্তি করিতাম। আমি ঈশ্বরকেও মান্য করি। সেই আমিই আজ বাপ-মার কথা লঙ্ঘন করিয়া ছেলেদিগকে কিছু করিতে বলিতেছি—এ কথাও সত্য! মা-বাপকেও ঈশ্বর উৎপন্ন করিয়াছেন। যদি ঈশ্বরের আজ্ঞা ও মা-বাপের আজ্ঞার মধ্যে বিরোধ বাধে তবে ঈশ্বরের আজ্ঞাকেই অধিক মান্য করিতে হয়—ইহাই আমি বলিয়া আসিতেছি।

মাতা-পিতার আজ্ঞা অপেক্ষাও তোমাদের অন্তরের বাণী বড়। তোমার অন্তরের আদেশ যদি বলে যে, মা-বাপ কেবল দুর্ব্বলতা হেতুই নিষেধ করিতেছেন, বস্তুতঃ সরকারী স্কুল ছাড়ার ভিতরেই পুরুষার্থ রহিয়াছে, তবে মাতা-পিতার কথা ঠেলিয়াও তোমরা সরকারী স্কুল ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু এমন অন্তরের আদেশ কাহার নিকট আসে? আমি অনেকবার বলিয়াছি আর এখনও বলি যে, সেই পিতা-মাতার আজ্ঞা ঠেলিতে পারে যাহার অন্তর বিনয়ে ভরা, যে সর্ব্বদা আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে ও যে নীতির নিয়ম বুঝিয়া লইয়াছে। যে ব্যক্তি

দয়া-ধর্ম্মকে নিজ-জীবনে প্রধান স্থান দেয়, যে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, যে নিজের হাত-পা দ্বারা ময়লা কাজ করে না, যে নিজের মনকে ময়লা করে নাই, যে অস্তেয়-ব্রত পালন করে, যে লালসার বশে অনেক প্রকার সঞ্চয় করে না, সেই বলিতে পারে যে, আমার অন্তরের কথা এই। তোমরা গান্ধীর কথা লইয়া তোমাদের বাপ-মার আদেশ ভাঙ্গিতে যাইও না। তোমরা নিজের মনের কথা লইয়াই পিতা-মাতার কাছে যাইও, তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিও—আমার দ্বারা তোমাদের আজ্ঞা পালন করানো চলিবে না।

যদি মা-বাপ ইহার সহায় না হইতেন তবে এই আন্দোলন যতদিন চলিতেছে ততদিন চলিত না। যেখানে মা-বাপ শ্রদ্ধা-শূন্য, অথচ যেখানে পুত্রের ভিতর আত্ম-বল আছে, সেইখানেই পুত্র বিনয়-পূর্ব্বক পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে—ইহাই আমার পরামর্শ। এই পরামর্শের ভিতর অনীতি, অবিচার বা অবিবেক নাই। যুবকদিগকে স্বাধীন ভাবে বিচার করার অধিকার সকল শাস্ত্রই দিয়াছে।

* * * *

এই প্রকার প্রশ্ন করা হইয়া থাকে যে, ছাত্রেরা কি ধরণের দেশ-সেবা করিতে পারে? তাহার সোজাসুজি উত্তর এই যে, ছাত্রেরা ভাল করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিবে, শরীর সুস্থ রাখিবে, ও দেশের জন্য বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই আদর্শ সম্মুখে রাখিবে। আমার

বিশ্বাস—ঐ প্রকার করিলেই ছাত্রদের পরিপূর্ণ দেশ-সেবা করা হয়। বিচার করিয়া জীবন কাটানোর দ্বারা ও স্বার্থ ছাড়িয়া পরোপকার করার উদ্দেশ্য বজায় রাখিতে পরিলে আমরা কিন্তু বিনা পরিশ্রমেই অনেক কার্য্য করিতে পারি।

ছাত্রদের জ্ঞানের মূল্য তাহাদের কাজের ভিতর রহিয়াছে। শত শত পুস্তকের বিদ্যা মাথায় ভরিয়া রাখার দাম আছে, কিন্তু সেই অনুসারে কাজ করার দাম আরও বেশী। মূল্য ততটা যতটার কার্য্য হয়। বাকী সবটা কেবল অকেজো-জ্ঞান। তাহা মাথা ভরিয়া রাখে—তাহা মাথার ভার মাত্র। সেই জন্যই ত সকল সময় আমি তোমাদিগকে এই অনুরোধই করি যে, তোমরা যাহা শিখিবে ও বুঝিবে সেই অনুসারে আরচণ করিবে—তাহাতেই তোমাদের উন্নতি হইবে।

* * * *

তোমাদের ভাল চাই বলিয়া তোমাদের একটা দোষের কথা বলিব। তোমরা তোমাদের মা-বাপের কাছে যখন ইংরাজীতে পত্র লেখ তখন দুঃখে আমার চোখ ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়। তোমরা যে পরের ভাষার ভিতর দিয়া স্বরাজ্য পাইতে চাও তাহাও অসম্ভব। আমার ইচ্ছা হয় যে, তোমরা অল্প সময়ের জন্য অন্য সমস্ত পাঠ অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়া হিন্দী শিখিয়া লও। যদি তোমাদের স্কুলে হিন্দী শেখা বাধ্যতা-মূলক নয় বলিয়াই না শিখিয়া থাক, তবে তোমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ বলা যায় না। যাহা রাষ্ট্রীয় শিক্ষার মূল-স্বরূপ সেই রাষ্ট্রীয় ভাষা শিক্ষা

দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা আমাদের স্কুল-কলেজগুলিতে নাই।..............
আমার পরামর্শ এই যে, যেমন সূতা কাটার জন্য তোমরা মন দিয়া লাগিয়াছ, হিন্দী শেখার জন্য তাহাই করিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—যে চতুর, নম্র, পরিশ্রমী ও দেশের জন্য যাহার টান আছে সে এ উভয় জিনিষই দুই মাসের মধ্যেই শিখিয়া ফেলিতে পারে।

এতখানি তৈয়ার হইলে তবে এই মাদ্রাজ অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের গ্রামের ভিতর গিয়া প্রজার সহিত তোমরা মন খুলিয়া কথা বলিতে পারিবে। ২২ কোটি ভারতবাসী তোমার হিন্দী বুঝিবে। এমন আর কোনও একটি ভাষা নাই যাহা এত লোকে জানে। ইহাদের সহিত যদি আত্মীয়তা করিতে হয় তবে তোমাদের হিন্দীই শিখিতে হইবে। এ জন্য যদি তোমরা তৈয়ার হও তবেই এত দিনের সাহস ও শক্তির ত্রুটি তোমরা খুব অল্প সময়েই দূর করিয়া দিতে পারিবে।

তোমরা বল—আমাদের সংসারের খাওয়া-পড়া চলিবে কি করিয়া? আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি গম ও আলু সিদ্ধ করিয়া পেট ভরাইতে পার না? প্রত্যেক ভারতবাসীর গড় পড়তা বার্ষিক আয় ২৩৲ টাকা। আমেরিকার লোকের আয় সে স্থানে ৪৯ পাউণ্ড (৬৩৭৲ টাকা) এই অবস্থায় তাহাদের মত খরচ করার অধিকার আমাদের কোথায়? আমাদের তিন কোটি ভাই-বোন মাত্র এক বেলা খাইতে পায়। ঘি-দুধ তাহারা দেখিতেও পায় না। তাহাদের ছেলে-পেলে দুধ বিনাই বাঁচে বা মরে। ছাত্রদের ত এ অবস্থা নয়। দারিদ্র্য স্বীকার করাই ত ছাত্রদের ধর্ম্ম। দারিদ্র্য স্বীকার করিবে—এ কথার মানে এমন নয় যে, না খাইয়া মরিবে,

অথবা প্রাথমিক আবশ্যকীয় দ্রব্য পাওয়ার চেষ্টা করিবে না। উহার অর্থ এই যে, অস্তেয় অপরিগ্রহ পালন করিবে।

যে দারিদ্র্য আমাদের আত্মা ও শরীর নাশ করে তাহা দূর করার জন্য ঠিক পথে উদ্যম করাই ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়। যেখানে উদ্যম আছে সেখানে আলস্য, অন্নাভাব ক্ষণকালের জন্যও টিকিতে পারে না। আমি আশা করি যে, তোমাদের স্কুলগুলি যেন মধুকরের গুঞ্জনে ভরা মৌচাকের মত হয়। তোমরা বল—'আমরা কেন হাতের কাজ করিব?' আবার বল—'যাহারা অশিক্ষিত তাহারাই শারীরিক কাজ করিবে, আমরা ত সাহিত্য ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ পড়িতেই সময় পাইয়া উঠিব না।' আমার মনে হয়—তোমাদের মজুরীর মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

যদিও কোনও নাপিত বা মুচি কলেজে যায় তবুও তাহার নাপিতের বা মুচির ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে নাই। আমি বলি—যেমন ডাক্তারি ব্যবসা ভাল, নাপিতের ব্যবসাও ঠিক সেই রকমেরই সমান ভাল। যতদিন না আমাদের হৃদয়ের সহিত আমাদের হাতের সুন্দর সহযোগিতা হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের জীবন সত্য হইয়া উঠিবে না।

* * * *

যখন তোমরা শিক্ষিত হইতে হইতে নাস্তিক হইয়া যাও এবং মাথন ফেলিয়া ঘোলের জন্য ছুট তখন আমি বলি যে, তোমাদের শিক্ষার মূল্য এক মুঠো ধূলার সমান। যখন আমি রামচন্দ্রের বিষয়ে কথা বলি, তখন তোমরা ছাত্রেরা আমাকে বল—"তোমার এই রামচন্দ্র কোথায়?" ইংরাজী পদ্ধতিতে

শিক্ষা লইয়া তাহাদেরই ইতিহাস শিখিয়া তোমাদের এই ধরণের প্রশ্ন আসে। আমাদের ছাত্রেরা পতিত হইয়া যাইতেছে। পশ্চিমের ছাত্রের আচার অনুকরণ করিয়া আমরা 'শেম্' 'শেম্' চেঁচাইতে শিখিয়াছি। যে স্কুল—যে সভা পছন্দ হয় না সে স্কুলে, সে সভায় যাইও না। কিন্তু সভায় গিয়া হাঙ্গামা করাকে হিন্দু বা মুসলমানী আচারে অভদ্রতা বলে। হাত-তালি দিয়া অপছন্দ জানানো আমাদের পদ্ধতি নয়। কেবল আচরণ দ্বারাই তোমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, তোমরা কি অপছন্দ কর। তোমাদের যদি অসহযোগ করিতে হয় তবে তোমাদের শাস্ত্র কি বলে তাহা তোমাদের বুঝা চাই। ইহা ধার্ম্মিক যুদ্ধ। অধর্ম্মকে ধর্ম্ম দ্বারাই আমরা হারাইয়া দিতে পারি, ধর্ম্মাচরণ দ্বারাই অধর্ম্মাচরণকে আমরা ঠেকাইতে পারি।

* * * *

যে সকল ছাত্রকে ২১ দিন ধরিয়া কঠিন রৌদ্রে আড়াই মাইল হাটানো হইয়াছিল তাহাদের উপর যে জুলুম হইয়াছিল, তাহা আমি জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যার অপেক্ষাও অধিক মনে করি। আমাকে যদি কেহ গুলি মারে তবে আমি তাহা ভুলিয়া যাই। কিন্তু যদি কেহ জোর-জুলুম করিয়া আমাকে দিয়া ইউনিয়ন জ্যাক্কে সেলাম করাইয়া লয় তাহা হইলে সে আমাকে বড় শক্ত অপমান করিয়াছে বলিয়া আমি মনে করিব। জালিয়ানওয়ালা-বাগে যাহারা মরিয়াছে তাহারা শহীদ হইয়াছে, ধর্ম্ম-হেতু জীবন দিয়া অমর হইয়াছে। কিন্তু যাহারা পেটের উপর ভর দিয়া চলিয়াছে —যাহারা নাক ঘসিয়াছে তাহারা সারা ভারতকে লজ্জা দিয়াছে। তোমরা

আর এ ভাবে হিন্দু-স্থানের অপমান হইতে দিও না। সম্ভবতঃ আবার 'মার্শাল-ল' চলিবে। আমি আশা রাখি যে, সে সময় একটি ছেলে বা মেয়েকেও কেহ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেলাম করাইতে পারিবে না। একটিও হিন্দু-মুসলমান বা শিখের পীঠে যেন গুলির ঘা না লাগে। কেহ মারের ভয়ে দমিবে—ইহার নাম সত্যাগ্রহ নয়। সত্যকার সত্যাগ্রহী গুলির সাম্‌নে সোজা দাঁড়াইয়া নির্ভর মারিয়া যায়। ইহাই স্বরাজ্য পাওয়ার সর্ত্ত। যদি এতটা শক্তি তোমাদের মধ্যে সঞ্চিত হয় তবে স্বরাজ তোমাদের হাতে। যদি তোমাদিগকে কেহ মারিতে আসে তবে তোমরা হাসিতে হাসিতে মরিয়া যাইও—ইহারই নাম আত্ম-বল।

* * * *

তোমরা যদি মনে কর যে, স্কুল বা কলেজের অবস্থা ঠিক সমান ভাবেই চলিতে থাকিবে, আর স্বরাজ্য পাইবে, তবে তোমরা বড় ভুলে পড়িয়াছ। কোন দেশই কষ্ট না পাইয়া, দুঃখের ভোগ না ভুগিয়া স্বরাজ পায় নাই—নূতন জন্ম পায় নাই। ভোগের অর্থ ত্যাগ নহে। ইংরাজীতে Sacrifice শব্দ যে ধাতু হইতে আসিয়াছে পবিত্র-করা তাহার অর্থ। অসহযোগ আত্ম-শুদ্ধির ক্রিয়া। আত্ম-শুদ্ধির জন্য যদি প্রচলিত কার্য্য-ব্যবহার ত্যাগ করিতে হয় তবে তাহা অবশ্যই করা চাই।

* * * *

সরকারের শিক্ষা মন্দ সেই জন্যই উহা ত্যাজ্য—এ যুক্তি আমার নয়। যাহারা আমাদিগকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছে তাহারাই এই শিক্ষা আমাদিগকে দেয়, সেই জন্যই আমরা ইহা সহিতে পারি না—ইহাই আমার বক্তব্য। গোলাম তাহার মালিকের নিকট হইতে কখনো স্বাধীনতা শিখিতে পারে না। এই রাজ্য-প্রথা নোংরা হইয়া গিয়াছে—এই রাক্ষস-প্রকৃতি সরকার যদি স্বাধীনতার শিক্ষা দিতে চায় তবে তাহার নিকট হইতে তাহাও আমি লইব না।

ইহাদের শিক্ষা যেমনতরই হোক্ না কেন, উহার মূলে আছে কি? বড় বড় বই পড়ানো হয় বলিয়া মুগ্ধ হইয়া যাও। উহা হইতে ত স্বাধীনতার খাঁটি শিক্ষা পাইবে না—উহা তোমাদিগকে কেবল ভুলায়। সত্য দেখিতে গেলে দেশের পয়সা চুরি করিয়া তাহার দ্বারাই এই মন-ভুলানো শিক্ষা আমাদিগকে দেওয়া হয়। এ শিক্ষা চুরি করিয়া তাহা হইতে কতকটা পয়সা দিয়া নেশা করা শেখানোর মত।

তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, পুরাণো পাঠ ভুলিয়া যাও। আজ যে স্বরাজ আমরা পাইতে চাহিতেছি উহা বর্ত্তমান রাজ্য-প্রথার হাল্‌কা নকল হয়, ইহা যেমন আমরা ইচ্ছা করি না, তেমনি আমাদের শিক্ষা-প্রথাও যেন প্রচলিত ধরণের হাল্‌কা নকল না হয়। তোমরা আশা করিও না যে, ইট ও পাথরের বাড়ী, সুন্দর সুন্দর বেঞ্চ ও চেয়ার তোমাদিগকে চেতনা দিবে। তোমরা কেবল চরিত্রের অনুসন্ধান করিবে। তোমাদের অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের নির্ম্মল চরিত্র হইতেই চেতনা পাওয়ার আশা রাখিও। তোমাদের কর্ম্ম-প্রেরণায় বল পাইবে তোমাদের অন্তর হইতে, তোমাদের আত্ম-বিশ্বাস হইতে, আর আমি নিশ্চয় করিয়া

বলিতেছি যে, ইহাতে তোমাদের পরে কখনো নিরাশ হওয়ার কারণ থাকিবে না।

* * * *

ছাত্রদিগকে বলি, তোমরা তোমাদের ক্রোধের উপর দখল রাখ, তোমরা কাহারও দ্বারা জোর করিয়া একটা কাজও করাইবে না। তোমাদের যদি এ কথা মনে হয় যে, সরকারী কলেজে থাকা হীনতা তবে আজই কলেজ ছাড়িয়া দাও। কিন্তু আর কাহারও উপর জোর করিও না। অপরকে বুঝাইবার কাজ নেতাদের। অসহযোগের ভিতরেও শিখিবার আছে। সে শিক্ষায় আমাদের শক্তি বাড়িবে। যে ভুল করে সে নিজের শক্তি খোয়ায়। তোমাদের শক্তি দ্বারা, তোমাদের কৃতিত্বের দ্বারা, তোমাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল লোকের উপর তোমরা প্রভাব বিস্তার কর।

তোমাদের ভিতরে যাহারা ইংলণ্ডের কথা জান, তাহাদিগকে আমি সেখানকার লড়াইয়ের দিনের কথা স্মরণ করিতে বলি। সেখানে প্রত্যেকটি বালক, প্রত্যেকটি বালিকা নিজেদের নিয়মিত পড়া ছাড়িয়া লড়াইয়ের কোনও-না-কোনও একটা কাজে লাগিয়া গিয়াছিল।

যখন আমি খেড়ার নব যুবকদের কাছে তাহাদের মা-বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও লড়াইতে যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলাম তখন আমার কার্য্য দেখিয়া সরকার এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। আজ সেই সরকারই কাঁচা বয়সের ছেলে-পেলেকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলায় দোষ ধরিতেছেন।

আমি তোমাদিগকে বলি—তোমাদের অন্তর তোমাদিগকে আজকার লড়াইতে যদি নিজেকে হোম করিয়া দিতে বলে তবে তোমরা অন্য সকল কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তোমাদের সকল সময় ও শক্তি স্বরাজ্য পাওয়ার জন্য দান কর। সকলের আগেই তোমরা চরখা লইয়া সূতা কাটিতে বসিয়া যাও।

* * * *

আমি হাজার হাজার ক্ষুদ্র-হৃদয় ছাত্রের কথা জানি যাহারা সরকারী চাকুরী পাওয়া যাইবে না—এই ভয়ে হতাশ হইয়া পড়ে। যে এই সরকারকে শোধরাইতে, নয় ত দূর করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছে সরকারের চাকুরির প্রশ্ন তাহার কাছে আসে কি করিয়া? যদি তুমি চাকুরির জন্য সরকারের কাছে না যাওয়াই ঠিক করিয়া থাক, তবে তোমার ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানে দরকারটা কি?

* * * *

ভারতবর্ষের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের জন্য যতক্ষণ আমরা স্বেচ্ছা-সৈনিক তৈয়ার করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ কংগ্রেসের নূতন নির্দ্দেশ হইতে লাভ করিতে পারিব—এ কথা বলা যায় না। তোমাদের দেখা চাই যে, গ্রামে গ্রামে এক-আধটা কংগ্রেস কমিটি বসিয়াছে। নব যুবকেরাই এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারে।

সারা ভারতবর্ষের ছাত্রদের জন্য ইহা সেবার এক নূতন পর্ব্ব। আমার হৃদয় এই সাক্ষী দেয় যে, যদি তোমরা এক একজন এই সেবার ক্ষেত্রে আসিয়া হোম কর, তবে এক বছরের পর এই কার্য্য করার জন্য অনুতাপ করার অবকাশই পাইবে না। বরঞ্চ সে দিন তোমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। কেন না তাহা হইলে তোমরা দেখিতে পাইবে—এই সময়ের ভিতরেই স্বরাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের মান তোমরা রাখিয়াছ। ঈশ্বর তোমাদিগকে, যুবক-যুবতীদিগকে আত্ম-শুদ্ধির এই পবিত্র সময়ে জয়-যুক্ত হওয়ার জন্য অটুট ধৈর্য্য, আশা ও শ্রদ্ধা দান করুন।

* * * *

আমার বুকে যে আগুন জ্বলিতেছে তাহা যদি তোমাদিগকে খুলিয়া না দেখাই, তবে নিজের প্রতি আমার কর্ত্তব্য করা হইবে না। এই জন্যই না আমি হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছি ও তোমাদিগকে আমার আশার কথা ও ধর্ম্মের কথা শুনাইতেছি।

* * * *

ভারতে যে কাপড় পাওয়া যায় সেই বস্ত্রই পরিব, নয় ত বস্ত্র ছাড়াই চালাইব। মা ছেলেকে রোগ-মুক্ত করার জন্য ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়া শরীর শোধরায়। তবে কি সারা ভারতকে রোগ-মুক্ত করার জন্য স্বদেশীর সাধারণ সর্ত্ত পালনেও আমরা

পরাঙ্মুখ হইব? সূতা কাটার জন্ম প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের ও বালকের কতকটা করিয়া সময় দেওয়া—এ ত সোজা কথা। আমি আশা করি, তাহারা আমাকে এ কথা শুনাইবে না যে, সূতা কাটা স্ত্রীলোকের কাজ। সরকারী শিক্ষালয় হইতে বাহির হওয়ার পর ইহাই তোমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। বাহির হইয়া আর কি করিব—এ কথা পরে ভাবিও। আমি তোমাদিগকে স্কুল-কলেজ ছাড়ার পর চরখা লওয়ারই পরামর্শ দিতে পারি। তোমরা এমন প্রচারক হইয়া যাও যে, তোমাদের পিছনে তোমরা যেন দুনিয়াটাকেও টানিয়া লইতে পার। কাপড় বোনায় বা সূতা কাটায় আমি কোন অপৌরুষ দেখি না। যে আমাকে বলে উহা পুরুষের অযোগ্য কাজ সে জানে না যে, পুরুষের কাজ কি। পুরুষ যখন হোটেলে কাজ করে তখন রান্না করার কাজের জন্ম সে পুরুষত্বহীন হয় না। এক সময় আমাকে হাজার লোককে খাওয়াইতে হইত, তখন আমি আরো বেশী করিয়া মর্দ্দ ছিলাম। সত্যকার অর্থ-শাস্ত্র চরখায়। তাহা কখনো রমেশচন্দ্র দত্ত, মিল, রাধাকমল মুখার্জ্জী দিতে পারেন না। ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার চাবি হইতেছে চরখা।

কথা-বার্ত্তা

প্রশ্ন—প্রচলিত শিক্ষা-প্রথা কি মন্দ ?

উঃ—আমি ত বলি হাঁ, উহা মন্দ। শিক্ষার বাহন ইংরাজী বলিয়া ছাত্রের মাথার উপর দ্বিগুণ বোঝা চাপানো হয়। আমার মনের ভাবের কথা তোমাকে কি বলিব ? প্রফেসার যদুনাথ সরকারের মত লোকও বলেন—এই পরদেশী বাহনের জন্তই শিক্ষিতবর্গের মগজ নির্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্য হইতে কল্পনা-শক্তি বা সৃজন-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের সময় কেবল পরের ভাষার উচ্চারণ ও ধরণ মনে রাখিতে রাখিতে কাটিয়া যায়। ইহা একটা বেগার খাটার মত ও ইহার পরিণাম এই হইয়াছে যে, আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার চোষ-কাগজের মত হইয়া আছি—উহা হইতে সরস বস্তু লওয়ার বদলে উহার ক্ষুদ্র অনুকরণকারী হইয়া পড়িয়াছি। আর একটা পরিণাম এই হইয়াছে যে, আমাদের ও সাধারণ লোকের মধ্যে একটা বড় নদীর মত ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা বুঝে এমন ভাষায় আমরা তাহাদিগকে রাজ-নৈতিক কথা ত দূরে থাকুক, শরীর, স্বাস্থ্য ও জন-হিতকর তত্ত্ব সমূহও বুঝাইতে পারি না। এখন আমরা প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণের মত অর্থহীন হইয়া গিয়াছি—তাঁহাদের চাইতেও বেশী খারাপ হইয়া পড়িয়াছি। কেন না তাঁহাদের অন্তর মলিন ছিল না। তাঁহারা রাষ্ট্রীয় সভ্যতার ট্রাষ্টি-স্বরূপ ছিলেন—আমাদের সে গৌরবও নাই। আমরা আমাদের শিক্ষারও অপব্যবহার করিতেছি। অথচ আমরা যেন জন-সাধারণের মুরুব্বী এমনই ভান

করি। এই বিশ্বাস আমার আজকার নয়, উহা অনেক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই প্রথাতে আমাদের যে আত্মা মরিতেছে সে কথা বলি নাই। ইংরেজেরা ধর্ম্মহীন শিক্ষারই পূজা করিয়া আসিতেছে—আর এ দিকে হিন্দুদের ধর্ম্ম-পূর্ণ শিক্ষা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডে এই পরিণাম এতটা হয় নাই। সেখানে ধর্ম্ম-গুরুরা কতকটা ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন।

প্রঃ—এই শিক্ষার বদলে আপনি কি পদ্ধতি আনিতে চান? আপনার মত অনুসারে দেশী ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া চাই, আর শিক্ষার মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষার স্থান চাই—এই ত?

উঃ—ঐ দুইটা দোষ ত দূর হওয়া চাই-ই, তাহা ছাড়া আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ভাবও নাই। শিক্ষক ও ছাত্রের ভিতর যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা দরকার আজ তাহা আদৌ দেখা যায় না। এখন যে সব শিক্ষক আছেন তাঁহাদের চেয়ে অনেক ভাল ও বিশেষ সংস্কার-যুক্ত শিক্ষকবর্গ আবশ্যক। এই তিন দোষ চলিয়া গেলে তবে শিক্ষা-পদ্ধতি শোধরাইবে।

প্রঃ—কাঁচা রকমের শিক্ষা আপনি অশিক্ষা অপেক্ষাও বেশী খারাপ বলেন—সে কি ঠিক?

উঃ—সম্পূর্ণ ঠিক।

প্রঃ—এ রকম মনে করার হেতু কি?

উঃ—আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিয়াছি যে, অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকগণ দেশের অশিক্ষিত জন-সাধারণের চাইতে বেশী দায়িত্বহীন ও বেশী বিচারহীন। এই অর্দ্ধপক্ক যুবকদের তুলনায় অশিক্ষিতেরা অনেক অংশে

বেশী স্থির-বুদ্ধি। আমার স্থির বিশ্বাস যে, এই অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদিগকে যদি এই মন্দ পথ হইতে ফিরাইয়া লওয়া যায়, তবে দেশের সম্মুখে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা একেবারে সহজ হইয়া যায়।

প্রঃ—আপনি কাহাকে অর্দ্ধশিক্ষিত বলেন ?

উঃ—উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—যাহারা ম্যাট্রিক পড়িয়াছে, যাহারা অল্প কিছু ইংরাজী জানে এবং তাহার চাইতেও কম ইংরাজী ইতিহাস জানে—এমন সব ছেলে। ইহারা ছাপার কথা পড়িয়া কিছুটা বা বোঝে, আর তাহা হইতে নিজেদের পূর্ব্ব-গঠিত সংস্কার না বদলাইয়া নিজেকেই উহার পরিপোষক বলিয়া মনে করে। ভারতবর্ষের পক্ষে ইহারা সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোক অপেক্ষাও ঢের বেশী ভয়ঙ্কর।

প্রঃ—ইহাদের জন্য আপনি কি করিতে চান ?

উঃ—আমি আমার নিজের ধারায় কাজ করিয়া যাইতেছি এবং আমি মনে করি যে, উহাতে আশাতীত ফল পাওয়া যাইবে।

প্রঃ—সে কেমন ?

উঃ—সাধারণ লোককে সাধারণতঃ যতটা অনুরোধ করা যায় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী করিয়া মাথা কুটিয়া বুঝাইতে হইবে। যদি আপনি ধৈর্য্য না খোয়াইয়া বসেন তবে আপনার যুক্তি অবশেষে তাহারা স্বীকার করিবে ও আপনার উপদেশ শুনিবে।

প্রঃ—আপনি কি এই বলিতেছেন যে, যাহারা ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তাহারা সকল রকমের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই তৈয়ারী হইয়া আছে, আপনি কেবল তাহাদিগকে ভাল পথ দেখাইয়া দিতে চান। তাহারা সহজে কথা শুনে না বলিয়া খুব চেষ্টা করিতে হইবে—এই ত ?

উঃ—আমার মতে এখনকার সমস্ত শিক্ষা-পদ্ধতিই এত খারাপ যে, লোকে সব শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পরেও স্থির মনে কোনও বিষয়ে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। এখন আমাদের মধ্যে এত বেশী সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত লোক আছেন যে, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া নিঃসন্দেহে শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা স্থির করিতে পারা যায়। আমি নির্ভয়ে আমার স্থির বিশ্বাস জানাইতেছি। আমি এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছি যে, আমাদের সমগ্র শিক্ষা-পদ্ধতি মূলেই পচা। সেই জন্য সম্পূর্ণ নূতন ভাবে উহাকে আবার রচনা করা দরকার।

প্রঃ—আসল কথা ত এই যে, লুটের ধন দিয়া আপনি আপনার ছেলেদিগকে শিক্ষা দেওয়াইতে চান না, কেমন?

উঃ—হাঁ, লুটের ধন দিয়া নয় ও লুট যাহারা করে তাহাদের পতাকার তলেও না। যে সরকারের প্রতি আমাদের একেবারেই শ্রদ্ধা নাই—প্রেম নাই সে সরকারের অধীনস্থ স্কুলের সহিত আমাদের লেন-দেন সম্পর্ক রাখাও উচিত নয়।

প্রঃ—আমাদের ইউনিভারসিটি ত ভারতবাসীরাই চালাইতেছে, চালাইবার রীতিও দেশী লোকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

উঃ—ইহা ঠিক কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা যদি আমার কথা শুনেন, তবে আমি বলিব যে, আপনারা "চার্টার" (সরকারী পাঞ্জা) ছিঁড়িয়া ফেলুন, তারপর উহাকে আমাদেরই ইউনিভারসিটি বলিব। সরকারী যে পয়সা পাওয়া যায় তাহা বন্ধ হইবার ভয় করিলে আমি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে রাজী আছি। আমি কেবল বলি যে, আপনারা ইউনিভার-সিটিটাকে রাষ্ট্রীয় করিয়া তুলুন। পণ্ডিতজীকে (মালবীয়জী) পর্য্যন্ত আমি

কি বলিয়াছি? বলিয়াছি—'বড়লাটকে তাঁহার পাঞ্জা ফিরাইয়া দিন। টাকা কম পড়ে তবে ভিক্ষা চাওয়া যাইবে। মহারাজাদের নিকট হইতে ভিক্ষা লওয়ার আপনার অননুকরণীয় ক্ষমতা আছে, আমি জন-সাধারণের নিকট হইতে ভিক্ষা লওয়ার কিছু শক্তি রাখি।'

প্রঃ—কিন্তু পাঞ্জাতে দোষটা কোথায়?

উঃ—যখন সরকারী পাঞ্জা আসে তখন তাহার সহিত সরকারের সবটাই আসে। পাঞ্জা আছে বলিয়াই 'বেনারস হিন্দু-বিদ্যা-পীঠ' ডিউক অফ কনটকে মান দিতে পারে। আমি তাহা কি করিয়া সহিব।

প্রঃ—রাষ্ট্রীয় শিক্ষাশালা হইতে পাস-করা ছাত্রেরা কি জীবিকার জন্য চিন্তা হইতে মুক্ত আছে?

উঃ—থাকা উচিত। ততটা মুক্তি যদি না দেয়, তবে সে বিদ্যা বিদ্যাই নয়। এই বিদ্যা ত্রি-বিধ মুক্তি দিবে—আর্থিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি। যে প্রথম প্রকারের মুক্তি পায় নাই তাহার অন্য দুইটা পাওয়াও সম্ভব নয়।

প্রঃ—রাষ্ট্রীয় সংস্থার চাকরদের স্বার্থত্যাগী হওয়া কি দরকার নয়?

উঃ—অবশ্য হওয়া চাই। যে স্বার্থত্যাগ করিতে পারে না সে দেশের চাকর হইতে পারে না—ইহাই আমার মত।

প্রঃ—বিদ্যা শেষ করার পর স্নাতকের কি দেশ-সেবাতেই নিজেকে সমর্পণ করা উচিত নয়?

উঃ—সকল সময়ের জন্য এই নিয়ম খাটে না। যখন রাষ্ট্র ধর্ম্মভাবে চলে তখন যাহারা সত্য সত্যই নির্ভীক ভাবে জীবন যাপন করে তাহারা সকলেই সেবা করে।

প্রঃ—আপনি ইংরাজী ভাষায় লেখেন কেন?

উঃ—আমার কাছে যে মূলধন আছে তাহা দেশের জন্য খরচ করিয়া ফেলিতে চাই।

প্রঃ—কেবল চরখার দিকেই মন দেওয়ায় চলিত শিক্ষা ভুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা কি আপনি করেন না?

উঃ—চরখা চালনার দ্বারাই আমরা বই-পড়া-বিদ্যা পাওয়ার যোগ্য হইব। এমন কি, চরখা চলার দরুণ এখনকার শিক্ষা সতেজ হইতেছে।

দ্বিতীয় ভাগ

দেশ-সেবায় শিক্ষার প্রয়োগ

গ্রামের উন্নতি

গ্রামের প্রশ্ন দিন দিন বিরাট ও বিকট হইতেছে। এখন এ সম্বন্ধে ভাল-মন্দ সাহিত্যও খুব বাড়িয়া চলিয়াছে—উহার মর্ম্ম লইয়া আলোচনা ও সংস্কারের প্রস্তাবও বাড়িয়া চলিয়াছে। রাশিয়ার গ্রামগুলির পুনর্গঠন স্থরু হইয়াছে ও তাহার বিস্তৃত ও উৎসাহ-জনক বর্ণনা ইংরাজীতে পাওয়া যায়। যে লেখার ভিতর দিয়া ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় তাহা যে শিক্ষিতদের নিকট চিত্তাকর্ষক হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! নিজে ব্যক্তিগত ভাবে বিচার করা ও পরীক্ষা করার বদলে আগ্রহ করিয়া বিবেচনা করার জন্য এই প্রকার সাহিত্য-পাঠই যে একমাত্র উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

গান্ধীজীর পথ ভিন্ন। তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা ও প্রজার শক্তি এবং তাহাদের মনোবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া সেই ভিত্তির উপরই প্রস্তাব বা সূচনা দেন। তিনি অনেক অভিজ্ঞতার কথা জানান ও নিজেদের দেশের প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি আস্থার সহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া তবে নিজের প্রস্তাব দেশের সম্মুখে উপস্থিত করেন। "দূরের পথের লোভ না করিয়া এক পা আগানোই যথেষ্ট"—এই মনোবৃত্তি লইয়া তিনি কাজ করেন বলিয়া এই গরীব দেশে আজই করা যাইতে পারে, এমন কাজের তিনি সূচনা দিতেছেন। এ গুলির ভিত্তি শুদ্ধ বলিয়া যে ভবিষ্যতেও হিতকারী হয়,

তাহাই এ পর্য্যন্ত আমরা এই ধরণের কাজে দেখিয়া আসিয়াছি। যাঁহাদের হাতে দেশের শিক্ষার ভার, যাঁহারা গ্রাম-সেবার পবিত্র কার্য্য হাতে লইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই অনুরোধ যে, এই পুস্তিকার প্রত্যেকটি বিষয় যত্ন করিয়া যেন তাঁহারা অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, কেবল তাত্ত্বিক চর্চ্চা করিয়া ফেলিয়া না রাখেন।

দত্তাত্রেয় বালকৃষ্ণ কালেলকর (কাকা সাহেব)

ঋষি-বাক্য

ইংরাজেরা এ দেশে পা ফেলার আগে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কুটিরে কাটা ও বোনা দ্রব্য দিয়া চাষের ব্যবস্থা ক্ষুদ্র জীবিকার অভাবটুকু পূরণ করিত। জীবন-সূত্রের মত ভারতবর্ষের এই গৃহ-শিল্প যে কি অমানুষিক ও নিষ্ঠুর উপায়ে নষ্ট করা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে কাহিনীর সাক্ষ্য ইংরাজেরাই দিয়াছে। ভারতবর্ষে এই প্রজারা আধ-পেটা খায়। ইহারা ধীরে ধীরে কি প্রকার মরার মত হইয়া যাইতেছে—শহর-বাসীর সে খেয়াল নাই। শহরবাসীরা এ কথা জানে না যে, তাহারা যে ক্ষুদ্র আয়েস-আরাম ভোগ করিতেছে তাহা বিদেশী ধনীদিগের (ক্যাপিটালিষ্ট) ঘর ধনে ভরাইয়া দিবার জন্য তাহারা যে মেহনৎ করিয়া থাকে তাহারই দালালীর স্বরূপ পায়, উহা আর কিছুই নহে। আর ঐ বিদেশী ধনীদের সমস্ত লাভ ও তাহাদের নিজেদের দালালী—এই দুইয়ের টাকাই ভারতবর্ষের প্রজাদিগকে পিষ্ট করিয়া উৎপন্ন হয়। তাহারা জানে না যে, আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সরকার এই ভাবে প্রজা-শোষণের কাজ চালাইবার জন্যই পরিচালিত হইতেছে। আজ হিন্দু-স্থানের গ্রামে গ্রামে যে কঙ্কালের মত মানুষ চলাফেরা করিতেছে তাহাদিগের সাক্ষ্য কিছু দিয়াই উড়াইয়া দেওয়া যায় না—বিতণ্ডাই কর, বক্র তর্কই কর, আর আঁক কষিয়া হিসাবই দেখাও। আমার মনে ত এতটুকুও সন্দেহ নাই যে, ঈশ্বর বলিয়া যদি কোনো মালিক

দুনিয়ায় মাথার উপর থাকেন, তবে তাঁহার দরবারে ইংলণ্ডকে ও এ দেশের শহরবাসীদিগকে এই অভূতপূর্ব্ব পাপের জন্য ও মানবজাতির বিরুদ্ধতা করার জন্য জবাব দিতেই হইবে।

(১৯২২ সালে আদালতে গান্ধীজী যে একরার করিয়াছিলেন তাহারই এক অংশ)

১

গ্রাম্য শিক্ষা

কাকা সাহেব গ্রাম্য শিক্ষার পূর্ণতা দিয়া অনেক কিছু করাইয়া লইতে চান। তাহার মধ্যে একটা হইতেছে এই—শিক্ষার বয়স যাহাদের সাধারণতঃ পার হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা হয়, এই প্রকার গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ যাহারা মহাগুজরাটের হাজার দশেক গ্রামে বাস করে তাহাদের যে কেহ ইচ্ছা করে সেই যেন এই গ্রাম্য শিক্ষা পাইতে পারে। শিক্ষা শব্দটির এখানে উদার অর্থ ধরিতে হইবে। ইহা বই-পড়া-বিদ্যার অতীত। গ্রামবাসীদের অনেক বিষয়ে আজ-কালকার দৃষ্টিতে ব্যবহারিক জ্ঞান নাই, বরঞ্চ তাহার বদলে অজ্ঞানময় ভুলে ভরা বিশ্বাস তাহাদের উপর রাজত্ব করিতেছে। এই শিক্ষার বিস্তার দ্বারা কাকা সাহেব এই অজ্ঞান দূর করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত জ্ঞান দিতে ইচ্ছা করেন।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে গ্রামের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে আবশ্যকীয় ও সহজ-প্রাপ্য জ্ঞানের অভাব, আমাদের দরিদ্র দশার একটা বড় কারণ। যদি গ্রামগুলিকে সংস্কার করা যায় তবে লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যায় ও সেই পরিমাণে লোকের অবস্থাও ভাল হয়। সুস্থ চাষা যতটা কাজ করিতে পারে রুগ্ন হইলে ততটা কখনই করিতে পারে না। সাধারণতঃ শতকরা যত লোক অন্যত্র মরিয়া থাকে আমাদের দেশে তাহার চাইতে বেশী মরে—ইহাতেও কম ক্ষতি হয় না।

সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমাদের স্বাস্থ্যের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ আমাদের আর্থিক দৈন্য এবং যদি ঐ দারিদ্র্য দূর করা যায় তবে স্বাস্থ্যও ভাল হয়। সরকারকে গাল দেওয়ার জন্য বা সকল দোষ তাহারই উপর চাপাইবার জন্য যদি ইচ্ছা হয়, তবে ঐ প্রকার বলিতে পার, কিন্তু কথাটার অর্দ্ধেকটাও সত্য নহে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই এ কথা জানিয়াছি যে, আমাদের স্বাস্থ্যের অভাব হওয়ার যতগুলি কারণ আছে তাহার মধ্যে দারিদ্র্যটা একটা ছোট অংশ মাত্র। উহার মধ্যে কিসের অংশ কত তাহা আমি জানি, কিন্তু সে কথা এখন পাড়িব না। যে সকল রোগ আমাদের নিজেদের দোষ হইতে হয়, যাহা সহজেই যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিয়া বা বিনা খরচে দূর করা যায় সেই সব রোগ নিবারণের উপায় ও পথই এখানে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

বস্তুতঃ এই দিক দিয়াই আমাদিগকে গ্রাম্য অবস্থা অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমাদের অনেকগুলি গ্রাম আবর্জ্জনার স্তূপের মত দেখায়। গ্রামে যেখানে-সেখানে লোকে মল ত্যাগ করে। ঘরের অঙ্গিনাও বাদ যায় না, আর তাহা ঢাকিয়া ফেলার জন্যও আমরা কোনো ইচ্ছা রাখি না। গ্রামের ভিতরে কোথাও রাস্তা ভাল অবস্থায় রাখা হয় না। রাস্তার উপর যেখানে-সেখানে ধূলার স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সে পথে আমাদের ও আমাদের বলদের পর্য্যন্ত চলায় কষ্ট হয়। পুকুরের জলে বাসন মাজা হয়, উহাতেই পশ্বাদিকে জল খাওয়ানো হয়, স্নান করানো হয়, কখনো-বা পশুগুলি উহাতে গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকে। সেই পুকুরেই ছেলে-পেলেরা, এবং বড়রাও মল ত্যাগের পর শৌচ করে, আর উহার

নিকটের জমিতে ত মল ত্যাগ করেই। আবার এই জলই খাওয়ার ও রান্নার কাজেও লাগানো হয়।

বাড়ীতে ঘর উঠাইতে কোনও প্রকারের নিয়মই মানা হয় না, ঘর তুলিতে পাড়া-পড়শীর সুবিধার কথা ভাবা হয় না, আর যাহারা ঐ ঘরে বাস করিবে তাহারা হাওয়া-আলো পাইবে কিনা তাহাও দেখা হয় না।

গ্রামবাসীদের ভিতর সহযোগিতা নাই বলিয়া নিজেদের স্বাস্থ্যের জন্য যে সব বস্তুর প্রয়োজন তাহারা সে গুলিরও রক্ষণাবেক্ষণ করে না। যে সময়টায় কোনও কাজ থাকে না সে অনাবশ্যক সময়ের সদ্ব্যবহার গ্রামবাসীরা করে না অথবা করিতে জানে না। এই জন্যই তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ক্ষীণ হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও নাই বলিয়া যখন রোগ হয় তখন সাদাসিধা ঘরোয়া চিকিৎসা না করিয়া অনেক সময় ঝাড়-ফুক্ ও মন্ত্র-যন্ত্রের জালে পড়িয়া নষ্ট পায়, উহাতে পয়সাও খরচ হয়, পাল্টা রোগও বাড়ে।

এই সকলের প্রতিকার কি করিয়া করা যায় এইবার তাহাই দেখা যাউক।

২
গ্রাম না আবর্জ্জনা-স্তূপ

মিকাটিন ১৯১৮ সালে ভারতবর্ষে ঘুরিয়া ফিরিতেছিলেন, মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড-সংস্কারে তাঁহার কতকটা হাত ছিল। ইনি আমাদের গ্রামের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিতেছেন ঃ—

"অন্যদেশের গ্রামের সহিত ভারতবর্ষের গ্রামের তুলনা করিলে মনে হয় যে, ভারতের গ্রামগুলি কি ভাগাড়ের স্তূপের উপরে বসানো!" এই সমালোচনা আমাদের ভাল লাগিবে না—এ কথা বুঝিতে পারি। কিন্তু কথাটার মধ্যে কোনও সত্য নাই—ইহা কেহ বলিতে পারিবে না। যে কোনও গ্রামের নিকট যাও না কেন সর্ব্বপ্রথমে আবর্জ্জনাই চোখে পড়িবে—আর অনেক সময় উচ্চ জমির উপরই এই আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকে। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেও গ্রামের বাহিরের দৃশ্যে ও ভিতরের দৃশ্যে বড় ভেদ দেখা যায় না। সেখানেও রাস্তায় ময়লা থাকে, ছেলেরা রাস্তায় গলিতে যেখানে-সেখানে মল ত্যাগ করে। প্রস্রাব ত বড়রাও যেখানে-সেখানে করিয়া থাকে। বিদেশী লোক এই অবস্থা দেখিলে আবর্জ্জনার ক্ষেত্র ও বস্তীর ভিতরে বিশেষ প্রভেদ করিতে পারিবে না, সত্য কথা বলিতে গেলে বিশেষ প্রভেদও নাই।

এই অভ্যাস যতদিনের পুরাণো অভ্যাসই হউক না কেন—উহা মন্দ অভ্যাস বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। মনু-স্মৃতি ইত্যাদি হিন্দুশাস্ত্রে, কোরান-শরিফ, বাইবেল ও জোরাস্ত্রার নির্দ্দেশে রাস্তা, আঙ্গিনা, নদী,

নালা ও কূপ—এ গুলি যাহাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে সূক্ষ্ম উপদেশ দেওয়া আছে। কিন্তু আমরা ত এখন সেগুলির অনাদরই করিয়া থাকি। এত বেশী ঐ সকল নিয়ম আমরা অগ্রাহ্য করি যে, তীর্থ স্থানগুলি পর্য্যন্ত আবর্জ্জনায় ভরা। তীর্থস্থান আরো বেশী নোংরা—এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হরিদ্বারের গঙ্গা-তীর হাজার-হাজার স্ত্রী-পুরুষ ময়লা করিতেছে—দেখিয়াছি। যেখানে লোকের বসার স্থান সেই স্থানেই যাত্রীরা মল ত্যাগ করে, গঙ্গায় গিয়া কুলকুচা ইত্যাদি করে, আবার সেইখানের জলই ব্যবহার করে। তীর্থ-ক্ষেত্রের পুকুরগুলিকেও আমি এই ভাবে নোংরা করিতে দেখিয়াছি। এরূপ করাতে দয়া-ধর্ম্মের লোপ হয়, সমাজ-ধর্ম্মের অপমান করা হয়।

..এই প্রকার উদাসীনতার জন্য হাওয়া খারাপ হয়, জল খারাপ হয়। ফলে কলেরা টাইফয়েড ইত্যাদি সংক্রামক রোগ যে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কলেরা রোগের উৎপত্তি খারাপ জল হইতেই হয়। টাইফয়েডের সম্বন্ধেও অনেকটা ঐ কথাই বলা যায়। যদি বলি যে, আধা-আধি রোগ নিজেদের কু-অভ্যাসের জন্য হয় তবে তাহা বাড়াইয়া বলা হইবে না।

এই জন্যই গ্রাম-সেবকের প্রধান ধর্ম্মই হইতেছে—গ্রামবাসীদিগকে পরিচ্ছন্নতার পাঠ শিক্ষা দেওয়া। এই প্রকার শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে বক্তৃতা দেওয়া বা পত্রিকা বিতরণ করার স্থান খুবই কম আছে। এই সকল নোংরামি শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে, সেই জন্য গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছাসেবকদের মুখের কথা শুনিতে প্রস্তুত হইবে না। যদি বা কথা কানেও শুনে তবু সে অনুসারে আচরণ করার উৎসাহ তাহাদের নাই। পুস্তিকাদি দিলেও তাহা পড়িবে না, অনেকে আবার পড়িলেও

বুঝিবে না এবং জিজ্ঞাসু নয় বলিয়া যে বুঝে তাহাকে দিয়া পড়াইয়াও লইবে না।

সেই জন্যই স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য হইতেছে হাতে-কলমে শেখানো। গ্রামবাসীদিগকে নিজে করিয়া দেখাইলেই তাহারা করিবে—আর তাহারা যে তখন করিবে সে বিষয়ও কোনো সন্দেহ নাই। তবুও ইহাতে ধৈর্য্যের আবশ্যকতা আছে। দুইদিন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করিয়া দেখাইলেই যে নিজের মত নিজে গ্রামবাসীরা কাজ করিবে—তাহাও ভাবিবার কোনো কারণ নাই।

স্বেচ্ছাসেবক প্রথমে গ্রামবাসীদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম কি তাহা বুঝাইতে থাকিবে। তখনই তাহাদের ভিতর হইতে স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাউক আর না যাউক, ময়লা সাফ করার কাজ তখনই সুরু করিয়া দিতে হইবে। তাহার জন্য যাহা আবশ্যক হয়, খুরপি, ঝুড়ি, বাল্‌তি, কোদালি ইত্যাদি গ্রাম হইতেই সংগ্রহ করিয়া লইবে। ফিরাইয়া দেওয়া হইবে জানিলে এ সকল দিতে কেহ অস্বীকার করিবে—এরূপ মনে হয় না।

এইবার স্বেচ্ছাসেবক রাস্তা খুঁজিয়া যেখানে মল-মূত্র আছে সেখানে উপস্থিত হইবে। খুরপি দিয়া উহা উঠাইয়া ঝুড়িতে লইবে—ও সে জায়গা ঢাকিয়া ফেলিবে।

যেখানে মূত্র আছে সেখানকার ভিজা মাটি খুন্তি দিয়া ঝুড়িতে তুলিয়া লইবে ও সে জায়গায় আশ-পাশের শুক্‌না ধূলা ছিটাইয়া দিবে। যদি রাস্তায় আবর্জ্জনা থাকে তবে ঝাড়ু দিয়া তাহা একত্র করিয়া এক পাশে রাখিবে। যথাস্থানে মল ফেলিয়া আসিয়া সেই ঝুড়িতেই আবর্জ্জনা লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলিবে। মল কোথায় ফেলিবে সে একটা বড় কথা। উহার

ভিতরে পরিচ্ছন্নতা আছে, ধন আছে। মল যদি বাহিরে ফেলিয়া রাখা যায় তবে দুর্গন্ধ ছাড়ে। উহাতে মাছি বসে আবার সেই মাছি আমাদের শরীরের উপর বসিয়া বা খাদ্যে বসিয়া রোগের বিষ চারিদিকে ছড়ায়। এই কাজটা মাছির দ্বারা কেমন করিয়া হয় যদি তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখা যায় তবে আমরা মিঠাই ইত্যাদি অনেক বস্তু যাহা খাই তাহা ত্যাগ করিতে হয়।

মল চাষাদের কাছে সোনার জিনিষ। যদি উহা ক্ষেতে ফেলা যায় তবে উহা হইতে সার হয় ও ভাল শস্য হয়। চীনের লোকেরা এই কাজে সব চাইতে পটু। শোনা যায় যে, তাহারা মল সোনার মতো করিয়া সংগ্রহ করিয়া কোটি কোটি টাকা বাঁচায়, আর সাথে সাথে অনেক রোগ হইতেও মুক্ত থাকে।

চাষা যদি এই কথা বুঝিয়া অনুমতি দেয় তবে তাহার ক্ষেতে উহা পুঁতিয়া ফেলিবে। যদি কোনো চাষা অজ্ঞতার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের পরিচ্ছন্নতা গ্রাহ্য না করে, তবে মল ভাগাড়ে কোনো এক জায়গায় পুঁতিবে। পুঁতিয়া ফেলিয়া রাস্তার পাশে যে আবর্জ্জনা রাখা হইয়াছিল তাহার নিকট যাইবে।

আবর্জ্জনা দুই রকমের হয়। এক হইতেছে সার করার উপযুক্ত—যেমন শাক-সবজীর খোসা, অন্নাদি, ঘাস ইত্যাদি। অন্য আবর্জ্জনা হইতেছে—কাষ্ঠ-কাঠি, পাথর, পাতা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে যেগুলি সার হইতে পারিবে তাহা ক্ষেতে অথবা যেখান হইতে সার একত্র করা যায় এমন স্থানে রাখিবে। কাঠ-কাঠি, পাতা ইত্যাদি যেখানে গর্ত্ত আছে তাহা ভরাট করার জন্য পুঁতিয়া ফেলিবে। এই প্রকার করিলে গ্রাম সাফ থাকিবে

আর লোকজন পথে নির্ভয়ে চলা-ফেরা করিতে পারিবে। দিন কতক পরিশ্রমের পরেই লোকের কাছে ইহার মূল্য নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। যখন বুঝিবে তখনই তাহারা সাহায্য করিতে আরম্ভ করিবে। অবশেষে তাহারা নিজেরাই এই কাজ করিতে আরম্ভ করিবে। নিজেরা যে আবর্জ্জনা ও মল উৎপন্ন করে প্রত্যেক চাষা তাহা যদি নিজ নিজ ক্ষেতে দেয় তবে কাহাকেও কাহারও বোঝা বহিতে হয় না ও সকলেই নিজের শস্যের দাম বাড়াইতে পারে।

রাস্তায় মল ত্যাগের অভ্যাস কদাচ করিতে নাই। ফাঁকা যায়গায় মল ত্যাগ করা বা ছেলে-পেলেকে করিতে বলা অসভ্যতা। এই অসভ্যতার জ্ঞান আমাদের আছে। কেননা ঐ সময় কেহ আসিলে আমরা মাথা নীচু করিয়া থাকি। সেই জন্যই প্রত্যেক গ্রামে এক স্থানে খুব সস্তায় পায়খানা গড়া চাই।

ভাগাড় এজন্য বিশেষ উপযোগী। এই স্থানের একত্রিত ময়লা সার করার জন্য কৃষকেরা লইয়া যাইতে পারে। আর যতদিন চাষারা এই ব্যবস্থা না করিতে পারে, ততদিন স্বেচ্ছাসেবক যেমন রাস্তার মল সাফ করিবে তেমনি ইহাও সাফ করিবে। প্রাতঃকালে সকলের পায়খানা ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে স্বেচ্ছাসেবক মল-মূত্র একত্র করিয়া উপরের লিখিত মত সাফ করিবে। যদি মল পুঁতিবার জন্য ক্ষেত না পাওয়া যায় তবে সে জন্য যেখানে মল পোঁতা হইবে সে জায়গাটা চিহ্নিত করিয়া রাখা চাই। ইহাতে পুঁতিবার সুবিধা হইবে। চাষারাও জানিবে, এবং সারে পরিণত হইলে তখন ক্ষেতে দিতে পারিবে।

মল বেশী গভীর গর্ত্তে পুঁতিবে না। মাটির নয় ইঞ্চ পর্য্যন্ত নীচে অসংখ্য পরোপকারী জীব আছে। অতটা নীচে যে মল রাখা যায় তাহা

পরিবর্ত্তন করিয়া সার করা ও ময়লা মাত্রকেই শুদ্ধ করা ইহাদের কাজ। এই কার্য্যে সূর্য্য-কিরণ দেবদূতের ন্যায় কার্য্য করে। যাহার এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় সে নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে তাহা করিতে পারে। কতকটা মল নয় ইঞ্চ মাটির নীচে পুঁতিয়া সারাদিন পরে খুঁড়িয়া তুলিয়া দেখিতে পারে যে, তাহা কি অবস্থায় আছে। আবার উহারই কতকটা ভাগ এক ফুট ও চার ফুট নীচে পুঁতিয়া কি হয় তাহাও দেখিতে পারে। এমনি করিয়াই অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। মল গর্ত্তে ফেলিয়া উহার উপর ভাল করিয়া মাটি চাপা দিবে যেন কুকুরে খুঁড়িয়া না ফেলে অথবা দুর্গন্ধ বাহির না হয়। কুকুর যাহাতে না খোঁড়ে সেজন্য উপরে কতকটা কাঁটা ফেলিয়া রাখা যাইতে পারে।

মল পুঁতিবার জন্য চৌকোণ বা লম্বা চৌকোণ গর্ত্ত করিবে। একবার যেখানে মলে পোঁতা হইয়াছে তাহার উপর আবারও মল পোঁতা চলিবে না। একবার পোঁতা হইলে শীঘ্র উঠাইয়াও লইবে না। আজ যেখানে খোঁড়া হইয়াছে তাহারই পাশে আর একটা ছোট গর্ত্ত পরদিনের জন্য ঠিকমত করিয়া রাখিবে। এমনি করিয়া কাটা মাটি সাজানো থাকিবে। দ্বিতীয় দিন আসিয়া মল ঢালিয়া মাটি ঢাকা দিয়া চৌরস করিয়া দিতে হইবে। এইভাবে কাজ চলিতে থাকিবে। এমনি করিয়াই তরকারীর খোসা ইত্যাদিরও সার করিবে। তরকারী-খোসার জন্য ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখিবে। মল ও তরকারী এক সাথে যেন পোঁতা না হয়। এই দুই জিনিষের উপর কীটগুলি একই রকম কাজ করে না। স্বেচ্ছাসেবকের মনে রাখিতে হইবে যে, যেখানে মল ফেলা হয় সেস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিবে—তাহার চৌরস সমান থাকিবে ও দেখিতে তাহা তাজা চষা ক্ষেতের মত দেখাইবে।

এখন যে সকল স্তূপ সার করা চলে না তাহার বিষয় বলিতেছি। এই স্তূপ কোনো গভীর গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলিবে অথবা গ্রামের আশে-পাশে যে গর্ত্ত আছে তাহাতে পুঁতিবে। ইহাও রোজই করিয়া যাইতে হইবে, দেখিয়া যাইতে হইবে ও সাফ রাখিতে হইবে।

মাস খানেক এই প্রকার করিলে গ্রামের আবর্জ্জনা দূর হইয়া গ্রাম সুন্দর পরিষ্কার হইবে। পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন যে, ইহাতে পয়সার কোনও প্রয়োজন নাই, ইহাতে সরকারের সাহায্যেরও আবশ্যক নাই, আর বিশেষ বৈজ্ঞানিক শক্তিরও আবশ্যক নাই। ইহার জন্য কেবল প্রেম-পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবক চাই।

৩

ঘুঁটে না সার

গত অধ্যায়ে আমরা মানুষের মল-মূত্রের কথা আলোচনা করিয়াছি। গরু-মহিষ ইত্যাদির মূত্রের কোনও ব্যবহার আমরা করি না বলিয়া উহাও দুর্গন্ধ বাড়াইবার কাজ করে। গোবর সাধারণতঃ ঘুঁটে তৈরীর জন্যই ব্যবহার হয়! ইহা গোবরের অপব্যবহার, অন্ততঃ ইহা যে গোবরের সব চাইতে খারাপ ব্যবহার—এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। গোবরের ঘুঁটে করা তেমনই একটা ব্যবস্থা, কসাইয়ের সুবিধার জন্য মহিষকে হত্যা করা যেমনতর ব্যবস্থা। ঘুঁটের আগুন ঠাণ্ডা বলিয়া ধরা হয়, ঘুঁটে দিয়া তামাক খাওয়া হয়। পাঞ্জাবের লোকের এই বিশ্বাস যে, ঘুঁটের আগুনে ঘি ভাল হয়। হয়ত ইহার ভিতর কিছু সত্য আছে এবং সেই কারণেই গোবর হইতে ঘুঁটে করা হয়। গোবরের ভাল ব্যবহার করিতে হইলে উহাতে আগুন করা ছাড়া আরও অনেক ভাল কাজ হইতে পারে। যে পরিমাণ ঘুঁটের দাম এক পয়সা, গোবরের উপযুক্ত ব্যবহার করিলে সেই পরিমাণ গোবর হইতে দশ পয়সা তোলা যায়। ইহা হইতে আরও নানা প্রকারের লোকসান হয়। যদি হিসাব করা যায় তবে এই লোকসান যে কত বিপুল তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

গোবরের সব চাইতে ভাল ব্যবহার হইতেছে উহা হইতে সার তৈরী করা। যাঁহারা চাষের শাস্ত্র জানেন তাঁহারা বলেন যে, গোবর পোড়াইয়া ফেলায় জমির ধক কমিয়া যায়। সার ছাড়া ক্ষেত আর মিষ্ট ছাড়া লাড়ু

সমান। গোবর পোড়াইয়া জমিতে রাসায়নিক সার ফেলে—এমন মূর্খ চাষা ভারতবর্ষে নাই বলিয়াই আমি মনে করি। চাষারা ইহাও বিশ্বাস করে যে, রাসায়নিক সার গোবর-সার হইতে নীচু দরের জিনিষ। রাসায়নিক সার হইতে যেমন লাভ হয় তেমনি ক্ষতিও হয়। যদিও শাস্ত্রজ্ঞেরা এ বিষয়ে পুরাপুরি পরীক্ষা করেন নাই তবুও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, রাসায়নিক সারে যেমন শস্যের পরিমাণ বাড়ে বা শস্য দেখিতে সুন্দর হয় গুণ তেমনি তাহার কমিয়া যায়। অনেক বৈজ্ঞানিক একথা মনে করেন যে, রাসায়নিক সার দিলে ক্ষেতে গম বেশী হয় এবং দেখিতে সুন্দর ও বড় হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক সার দেওয়া ক্ষেতে যে গম হয় তাহা পরিমাণে কম হইলেও তাহাতে মিষ্টত্ব ও পোষ্টাই-গুণ অনেক বেশী থাকে। যখন পরীক্ষা ভাল করিয়া হইবে তখন হয়ত রাসয়নিক সারের যে মূল্য আজ ধরা হয় তাহা হইতে তাহার দাম ঢের কমিয়া যাইবে।

এরূপ হউক বা না-ই হউক, গোবরের ব্যবহার যে কেবল সারের জন্যই করিতে হইবে—এ বিষয়ে সকলে এক মত। কি করিয়া পশ্বাদির মল গোবর ও মূত্র সারে পরিণত করিতে হইবে সে বিষয়ে গ্রামবাসীদিগকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দেওয়ার কাজ স্বেচ্ছাসেবকেরই। ঘুঁটিয়া সম্বন্ধে লোকের ভুল দূর করিতে হইবে, ঘুঁটিয়ার বদলে আর কি দিয়া জ্বালানীর কাজ চলে তাহাও তাহারা খুঁজিয়া দেখিবে এবং গোবর ও গো-মূত্রের সারের মূল্যের কথা নানা প্রকারে তাহারা সকলকে বুঝাইয়া দিবে। এ সব কথা বুঝাইয়া দিবার শক্তি স্বেচ্ছাসেবকের যোগাড় করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই সমস্ত বিষয় যেমন রস-পূর্ণ তেমনি ফলদায়ক। যে স্বেচ্ছাসেবক উদ্যমশীল তাহার পক্ষে ইহাতে জ্ঞানের ভাণ্ডারও উন্মুক্ত রহিয়াছে। পাঠকগণ দেখিবেন যে, যেমন মনুষের

মল-মূত্র সম্বন্ধে তেমনি এ সম্বন্ধেও পয়সার আবশ্যকতা বা গভীর পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা নাই। কেবল যে প্রেমের কথা গত অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি সেই প্রেমই স্বেচ্ছাসেবকের দরকার।

৪

গ্রামের রোগ

লোক-শিক্ষার আবশ্যকতার ভিতর অক্ষর-জ্ঞান অথবা পুঁথি-পড়া-শিক্ষার স্থান নীচে। জীবনের মুখ্য অঙ্গগুলিব ভিতর অক্ষর-জ্ঞানের স্থান নাই—এমন বলা যায় না। কিন্তু মোক্ষ হইতেছে আমাদের একটা চরম শান্তি-পূর্ণ অবস্থা। ঐহিক ও পারলৌকিক মোক্ষের জন্য ও স্বরাজ পাওয়ার জন্য যে অক্ষর-জ্ঞান আবশ্যক নাই—এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কোটি কোটি লোকের অক্ষর-জ্ঞান পাওয়ার পর যদি স্বরাজ পাইতে হয় তবে সে স্বরাজ পাওয়ার শক্তি আমাদের নাই। দুনিয়ার মহা মহা শিক্ষাদাতা যাঁহারা তাঁহাদের—যিশু প্রভৃতির অক্ষর-জ্ঞান ছিল, এ কথা ত কেহ বলে না।

এই পুস্তিকা লেখার মূলে যে কল্পনা রহিয়াছে তাহাতে অক্ষর-জ্ঞান শেষে স্থান পায়। ঐ জ্ঞান সাধন মাত্র, সাধ্য নয়। কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত ও বয়স্ক কোটি কোটি চাষার সাধন হিসাবে কি জ্ঞানের আবশ্যক আছে—তাহার আলোচনা যদি করা যায় তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, অক্ষর-জ্ঞান পাওয়ার পূর্ব্বে, আরও অনেক কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান তাহারা এখনই পাইতে পারে। মিষ্টার ব্রেনের পুস্তকেও এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাহাতেও আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, অক্ষর-জ্ঞান ছাড়া দেওয়ার উপযুক্ত আরো অন্য রকমের জ্ঞানও আছে।

বস্তুতঃ এই দৃষ্টিতেই আমরা গ্রাম পরিষ্কারের কথা আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বে যে সকল জ্ঞানের কথা বলিলাম তাহা চাষারা সহজেই লইতে পারে। ঐ জ্ঞান পাওয়ার যে বাধা তাহা হইতেছে শিক্ষকের অভাব ও চাষার আলস্য।

এক্ষণে গ্রামের সাধারণ রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমার গ্রামবাসী সকল সাথীরই এই অভিজ্ঞতা যে, গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ জ্বর কোষ্ঠ-বদ্ধ ও ফোঁড়া—এই কয়টা রোগে ভোগে। আরও নানা প্রকারের রোগই হয়, কিন্তু তাহার বিচার করার প্রয়োজন এখন নাই। যে রোগে সাধারণতঃ চাষাদের কাজের ক্ষতি হয় তাহা হইতেছে উপরোক্ত তিন প্রকার রোগ। এই রোগগুলির ঘরোয়া ঔষধ তাহাদের জানিয়া লওয়া উচিত। ইহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় আমাদের কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়।

তাহা ছাড়া এইসব রোগ সহজেই বন্ধ করা যায়। স্বর্গগত ডাক্তার দেবের তত্ত্বা-বধানে চম্পারাণে যে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহার দ্বারাই এই রোগগুলি নিবারণ করা হইত। স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট তিনটার বেশী চারটা ঔষধ ছিল না। সেখানকার অভিজ্ঞতাও ঐ কথাই বলে। কিন্তু এই পুস্তিকায় সে বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও রস-যুক্ত বিষয়। এখানে কেবল ইহাই দেখাইতে চাই যে, এই তিন প্রকার ব্যাধির শাস্ত্রমতে চিকিৎসা করিতে চাষাদিগকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। সে শিক্ষা দেওয়াও সহজ। যদি গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তবে অনেক রোগের সৃষ্টি হওয়াই বন্ধ হয়। সকল চিকিৎসকই জানেন যে, রোগের সর্ব্বোত্তম চিকিৎসা হইতেছে রোগ হইতে না দেওয়া। বদ-হজম বন্ধ করিলে

কোষ্ঠ-বদ্ধ বন্ধ হয়। গ্রামের হাওয়া নির্ম্মল রাখিলে জ্বর বন্ধ হয়। গ্রামের জল পরিষ্কার রাখিলে ও নিত্য স্নান করিলে ফোঁড়া হয় না। আর এই তিন প্রকার রোগের পক্ষেই ভাল ঔষধ হইতেছে উপবাস করা। উপবাসের সময় কটি-স্নান ও সূর্য্যের কিরণ লাগানো (সূর্য্য-স্নান) দরকার। এই বিষয়টার বিশেষ বিবরণ আমার স্বাস্থ্য-রক্ষা নামক পুস্তকে আছে। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে উহা দেখিয়া লইতে আমি পরামর্শ দিতেছি।

গ্রামে হাসপাতাল থাকা চাই। যদি তাহা না হয় তবে একটা ডিস্‌-পেন্‌সারী ত চাই-ই—এই রকম অনেকে মনে করেন বলিয়া চারিদিকে দেখিতে পাই। আমি ত ইহার আবশ্যকতা আদৌ দেখি না। গ্রামের আশে-পাশে এই প্রকার সংস্থা যদি গড়িয়া উঠে ত সে ভাল কথা। কিন্তু উহা যে বড় একটা কিছু ব্যাপার—এ কথা বলিতে চাই না। যদি হাসপাতাল থাকে তবে অবশ্য রোগী পাঠাইতে হইবেই। ইহা হইতে কেহ যেন এ কথা মনে না করেন যে, সাত লক্ষ গ্রামে সাত লক্ষ হাসপাতাল বসানো একটা মহা উপকারের কাজ। গ্রামের স্কুলকেই ঔষধালয় করা যায় আর উহাতেই পাঠাগারও খোলা চলে। সকল গ্রামেই রোগ হয়, সকল গ্রামের জন্যই পাঠাগার চাই, আর স্কুল ত চাই-ই। এই তিনটা জিনিষ আলাদা আলাদা বাড়ীতে করিতে গেলে এবং সকল গ্রামে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে গেলে কোটি কোটি টাকার দরকার। তাহাতে সময়ও খুব লাগিবে। সেই জন্যই লোক-শিক্ষা ও গ্রাম্য সংস্কারের বিষয়ে বিচার করিতে বসিয়া আমাদের দেশের অত্যন্ত গরীব অবস্থার কথাটাও স্মরণ রাখিতে হইবে। যে দেশের প্রজারা পরের দেশ লুট করিয়া ধনী হইয়াছে তাহাদের দেওয়া উপদেশ

আমাদের গ্রহণ করা উচিত নহে। যদি আমাদের ভিতর সত্যই জাগৃতি উপস্থিত হইত তবে গ্রামের রূপ কবে বদলাইয়া যাইত।

৫

কূপ ও পুকুর

পূর্ব্বের মত এখনও গ্রাম বসাইতে হইলে সে জায়গার জলের খোঁজ লইতে হয়। যদি জলের সুবিধা না থাকে ও সুবিধা করা সম্ভবও না হয় তবে সেখানে গ্রাম বসাইবার ব্যবস্থা করিতেই নাই। দক্ষিণ ভারতে অন্য রকমে ভাল উচ্চ স্থান অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে জলের সুবিধা নাই বলিয়া গ্রাম বসানো যায় নাই। হাওয়া লোকের প্রথম আবশ্যক, আর সেই জন্য কোথাও হাওয়া খুঁজিতে হয় না। তাহার পরেই দরকার জলের। যদি হাওয়ার মত জল সহজ-প্রাপ্য না হইত, তবে অন্নাদি উৎপন্ন করিতে ও সংগ্রহ করিতে কষ্ট হইত। আবার হাওয়াও যেমন ভাল হওয়া চাই, জলও তেমনি ভাল হওয়া চাই।

গ্রামের লোকেরা এ কথাটা জানে না অথবা জানিলেও এ বিষয়ে তাহারা উদাসীন থাকে—ইহা আমরা সকল স্থানেই দেখিতে পাই। সেই জন্য গ্রামের লোকদিগকে যে সকল শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবকের দিতে হইবে তাহার মধ্যে জলের বিষয় শিক্ষা দেওয়া বিশেষ দরকারী। আর এই শিক্ষা দেওয়ার বেলাতেই স্বেচ্ছাসেবকের ধৈর্য্যের পরীক্ষা হইবে। গ্রামবাসীরা নিজেরা পরিশ্রম করিয়া জল সাফ রাখার ব্যবস্থা খুঁজিবে, অথবা উহার প্রয়োগ করিবে—ইহার আশাও করিতে নাই। ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদিগকে জল পরিষ্কার রাখার নিয়ম বুঝাইয়া যাইতে হইবে ও যাহাতে তাহারা সেই উপদেশ মত কাজ করিতে পারে সে বিষয়ে সাহায্যও করিবে। অনেক স্থলেই

এই রূপ দেখা যায় যে, নিজেদের লাভের জন্য যাহা করা উচিত সে বিষয়েও তাহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়। এই অবস্থায় সেবক একাকীই খাটিয়া যাইবে, মজুরী করিবে, আর নিজের হাতে যতটুকু পারে ততটুকু কাজ করিয়া গ্রামবাসীদিগকে লজ্জা দিবে।

এখন কি করা যাইবে তাহারই খোঁজ করা যাউক্। অনেক গ্রামে একটা মাত্র পুকুর আছে। উহাতেই পশ্বাদি জল খায়, লোকে স্নান করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, আবার সেই জলই নিজেদের পানার্থে ব্যবহার করে। যাঁহারা স্বাস্থ্য-বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, এই রকম জলে নানা প্রকারের বিষাক্ত জীবাণু উৎপন্ন হয় ও এই প্রকার জল পান করিলে সহজেই কলেরা ইত্যাদি ব্যাধির উৎপত্তি হয়। খানিকটা সাবধান হইলেই এই প্রকার পুকুর সাফ রাখা যায়। গ্রামের পুকুরের পাড় এমন করিয়া বাঁধিবে যে, তাহাতে পশু না নামিতে পারে। কিন্তু পশুদেরও ত জল পান করার ব্যবস্থা থাকা চাই ; এ জন্য পুকুরের কাছেই চৌবাচ্চা বাঁধাইয়া দিবে। অনেক কূপের কাছে এ রকম থাকে। উহাতে গ্রামের লোক সকলে মিলিয়া এক এক কলসী জল যদি রোজ ঢালিয়া যায় তবে উহা জলে ভরাই থাকিবে।

পানীয় জলের পুকুরে বাসন কিম্বা কাপড় ধুইতে নাই। দুই উপায়ে ইহা করা যায়। এক হইতেছে এই যে, বাড়ীতে জল তুলিয়া লইয়া গিয়া সেখানেই কাপড় ধুইয়া লইবে, আর অন্যটি হইতেছে—পুকুরের পাশেই চৌবাচ্চা রাখা, উহাতে প্রত্যেকেই নিজের ভাগের মত জল ভরিয়া যাইবে ও ঐ জল সকলে ব্যবহার করিবে। গ্রামবাসীদের ভিতর যদি এই প্রকার সহানুভূতি দেখানো ও পরোপকার করার ইচ্ছা হয় তবে এ ব্যবস্থা

অনায়াসেই হইতে পারে। কিন্তু যদি এই ভাবে হাতে হাতে কাজ না হয়, তবে অল্প খরচাতে চৌবাচ্চাগুলি ভরাইয়াও রাখা যায়। কাপড় ধোয়ার জায়গায় জল ফেলা ত হইবেই, সেই জন্যই সেখানকার খানিকটা জায়গা পাকা করিয়া লওয়া দরকার যাহাতে পাঁক না হয়। জলের কলসীও পুকুরে ডুবাইবার পূর্ব্বে বাহিরে সাফ করিয়া তবে পুকুরে ডুবাইবে। এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যে, জল ভরিতে গেলে জলে পা না পড়ে। এক প্রকার অবস্থার ইহাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। কতকগুলি গ্রামে একাধিক পুকুর আছে অথবা একাধিক পুকুর খনন করা যায়—এরূপ ব্যবস্থাও আছে। সেখানে পানীয় জলের পুকুর একেবারে আলাদা করাই ভাল।

আর এক শ্রেণীর গ্রামে কূপ হয়। কূপের জলও সাফ রাখা চাই। উহার চারিদিকে বেড়া দেওয়া ও পাঁক না হয় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। মাঝে মাঝে কূপ সাফ করা চাই। এ সকলই স্বেচ্ছাসেবক নিজে করিয়া গ্রামবাসীদের দ্বারা করাইতে থাকিবে। এই শিক্ষা সস্তা, সত্য ও আবশ্যক।

৬

গ্রামের রাস্তা

আমরা এতক্ষণ দেখিয়াছি যে, গ্রামের আবর্জ্জনা কেমন করিয়া দূর করা যায়। উহা হইতে এক দিকে যেমন অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর হয়, আবার অন্য দিকে তেমনি সোনার সারও তৈয়ারী হয়। ঘুঁটের জন্য গোবরের ব্যবহার না করিলে গ্রামের শস্য সহজেই তাহা দ্বারা বাড়িতে পারে। কূপ-পুকুর সাফ রাখিয়া স্বাস্থ্য-রক্ষা কেমন করিয়া করা যায় তাহাও আমরা বলিয়াছি।

এখন গ্রামের রাস্তার দিকে নজর দেওয়া যাউক্। গ্রামের রাস্তা দেখিতে ত বাঁকা-চোরা। উহার উপর ধূলার স্তূপ জমিয়া থাকে যাহা সমান করিয়া ফেলা হয় নাই। উহার উপর দিয়া চলিতে মানুষের যেমন কষ্ট হয় গাড়ী টানিতে পশুরও ঠিক তেমনি কষ্ট হয়। ফলে গাড়ীও ক্রমে ক্রমে এত ভারী করিয়া তৈয়ার করিতে হয় যে, বলদকে ডবল বোঝা মিছামিছি টানিতে হয়।

ধূলার জন্য চলায় কষ্ট ও গাড়ীতে ওজন বহিবার বেশী খরচ হয়। যদি রাস্তা পাকা হয় তবে বলদ ডবল মাল টানিতে পারে, গাড়ী ভাড়া সস্তা হয় ও গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এখনকার অবস্থা ত অতি শোচনীয়। বর্ষাকালের চারি মাস এই রাস্তার অবস্থা এমন হয় যে, কাদায় গাড়ী হাঁকাইতে হয় ও মানুষকে সাঁতরাইতে বা কোমর অবধি জলে কাপড় ভিজাইয়া চলিতে হয়। ইহাতে অনেক প্রকারের রোগ হয়।

যেখানে গ্রামটাই ভাগাড়ের মত, যেখানে কুয়া-পুকুরের দিকে কেহ দৃষ্টি দেয় না, যেখানে রাস্তা মান্ধাতার আমল হইতে একই রকম রহিয়াছে, সেখানে ছেলে-পেলের অবস্থাই বা অন্য কি রকম হইবে? ছেলেদের ব্যবহার ও তাহাদের চাল-চলন গ্রামের অন্য অবস্থার মতই হয়। গ্রামের রাস্তার যেমন যত্ন ছেলেদেরও তেমনি যত্ন হয়। কিন্তু এ বিষয়ে এখন বলিতে যাওয়া অবান্তর।

এখন এই রাস্তায় কি করা যায়? লোকের ভিতর যদি সহযোগিতার ভাব থাকে তবে বিনা খরচায় অথবা সামান্য খরচায় কাঁকর আদি যোগাড় করিয়া তাহারা নিজেদের গ্রামের মূল্য বাড়াইতে পারে। এই প্রকার একজোটে কাজ করিতে পারিলে তাহা দ্বারা ছোট-বড় সকলেই সত্য শিক্ষা বিনামূল্যে পায়। যদি সম্ভব হয়, মজুর লাগাইয়া কাজ করাইয়া লওয়াও গ্রামবাসীর উচিত। গ্রাম-বাসী সকলেই চাষা, সকলেই সেই জন্য স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের মজুর। আবশ্যক হইলে পড়শী মজুরের সাহায্য তাহারা গ্রহণও করে। যদি গ্রামবাসীরা প্রতিদিন খানিকটা করিয়া সময় রাস্তার জন্য দেয় তবে অল্প সময়েই রাস্তা ভাল হইয়া যায়। এই সব কাজ করার জন্য গ্রামের রাস্তা ও গলি, অপর গ্রামে যাইবার পথ—এ গুলি সব নক্সায় তুলিয়া লইয়া নিজেদের শক্তি অনুযায়ী কাজের পদ্ধতি গড়া দরকার। পদ্ধতি এমন করিতে হইবে যে, তাহাতে গ্রামের পুরুষ, স্ত্রী ও বালক—সকলেই কম বা বেশী কাজের অংশ লইতে পারে। এত কাল পর্য্যন্ত আমরা নিজ পরিবার লইয়াই মত্ত ছিলাম। গ্রাম সংস্কারের ভিত্তিই এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সমস্ত গ্রামটাই একটা পরিবার। গ্রামে এই ভাব কতটা আছে তাহা দিয়াই গ্রামের সভ্যতা

মাপা যায়। প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক লোক যেমন পরিবারের অপর ব্যক্তির ঘর সাফ করিয়া থাকে, তেমনি প্রত্যেক পরিবারের নিজের গ্রামের সম্বন্ধেও ঐ কাজ করিতে প্রস্তুত হওয়া চাই। এইরূপ হইলেই গ্রামবাসী সুখে থাকিতে পারে ও স্বাবলম্বী হয়। আজ ত প্রত্যেক বিষয়েই সরকারের দিকে তাকাইয়া থাকা হয়। সরকার জঞ্জাল সাফ করিবে, সরকার রাস্তা বানাইবে, রাস্তা মেরামত রাখিবে, সরকার কুয়া-পুকুর সাফ রাখিবে, সরকার বালকদিগকে পড়াইবে, সরকার বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ার হইতে আমাদিগকে বাঁচাইবে, সরকার আমাদের দ্রব্য-সম্পত্তি রক্ষা করিবে। এই মনোবৃত্তি হইতে আমরা অসাড় হইয়া পড়িয়াছি ও যত বেশী এই পথে চলিতেছি ততই বোঝা বাড়িতেছে। যদি গ্রামবাসীরা গ্রামের পরিচ্ছন্নতা ও শোভা রক্ষার জন্য নিজেদিগকে দায়ী করে, তবে সকল সংস্কারই শীঘ্র ও প্রায় বিনা পয়সায় হয়। কেবল তাহাই নয়, যাতায়াতের সুবিধার জন্য ও স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার জন্য গ্রামের আর্থিক অবস্থাও অনেকটা ভাল হয়।

রাস্তা সাফ করার বেলায় কতকটা বুদ্ধি খাটানো দরকার। নক্সার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সকল রাস্তা পাকা করিতে বা ভাল করিতে একই জাতীয় সরঞ্জাম চলিবে না। কোথাও বা পাথর আছে, আবার খুঁজিলেও কোথাও বা পাথর মিলে না—যেমন বিহারে। রাস্তা পাকা করার জন্য কি উপায় লইতে হইবে তাহা খোঁজ করার কাজও আমাদের কল্পিত স্বেচ্ছাসেবকেরই। গ্রাম-সেবক আশে-পাশে ঘুরিয়া দেখিবে ও এ বিষয়ে সরকারী প্রথা হইতে যদি কোনও শিক্ষা পাওয়া যায় তবে তাহাও লইবে। রাস্তা পাকা করার জন্য সরকার যে সকল দ্রব্য ব্যবহার

করে তাহার মধ্যে যেগুলি গ্রহণ করা সম্ভব সে তাহাও গ্রহণ করিবে। অনেক স্থানে গ্রামের বুড়াদের এ বিষয়ে ভাল জ্ঞান আছে। তাহাদের খোঁজ করিয়া তাহাদিগকে কাজে আনিতে স্বেচ্ছাসেবকেরা যেন সঙ্কোচ না করে। অন্য বিষয়ে যেমন এ বিষয়েও তেমনি নিজের হাতে কাজ করার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই গ্রাম-সেবক রাস্তা পাকা করিতে আরম্ভ করিবে।

জগতের পিতা

১

"ওরে চাষা, তুই হোস্ এই জগতের সত্য পিতা।"

এই ভাবেই পাঠশালায় আমরা প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া থাকি। উহার অর্থ কি ও জগতের পিতার প্রতি আমাদের ভক্তি কত কম তাহার কতকটা আভাস শ্রীযুক্ত চণ্ডুলালের লেখায় পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত চণ্ডুলাল চাষাদের অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে অথচ খুব মনোরম ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি কাঠিয়াওয়াড়ের চাষাদের সম্বন্ধেই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখা বিশেষ ভাবে কাঠিয়াওয়াড়ের চাষের জন্য প্রযুক্ত হইলেও সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চাষের বেলাতেও খাটে। যে পর্য্যন্ত শিক্ষিতেরা চাষার কথা বিচার করিবে না, জানিবে না, অনুভব করিবে না সে পর্য্যন্ত এই অবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

চাষাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অগ্র-গামীরা অল্প-বিস্তর পরিচয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়াও গিয়াছেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনাও করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের অবস্থার অভিজ্ঞতা না থাকায় উহাতে সত্যকার কোনো পরিবর্ত্তন হইতে পারে নাই।

সরকারী কর্ম্মচারীরা চাষাদের অবস্থা নিঃসন্দেহে জানেন। কিন্তু সরকারী চাকুরেদের অবস্থা সত্যই শোচনীয়। তাঁহারা সরকারী চাকুরের দৃষ্টিতে অর্থাৎ খাজনা কতটা তোলা যায় সেই দৃষ্টিতেই চাষাদিগকে দেখেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে কর্ম্মচারী খাজনা বসাইয়া উহা আদায় করাইতে

পারেন তাঁহারই উন্নতি হয়, তিনি পদবী পান ও কাজের লোক বলিয়া গণ্য হন। যে দৃষ্টিতে আমরা যে জিনিষ খুঁজি সেই দৃষ্টিতে আমরা সে জিনিষ দেখি। সেই জন্য যে পর্য্যন্ত চাষার দৃষ্টি দিয়া চাষার অবস্থা না খুঁজিব সে পর্য্যন্ত সে অবস্থার খাঁটি চিত্র আমরা পাইতে পারিব না।

তবুও কতকটা পরিমাণে আমরা তাহাদের অবস্থা জানিতে পারি। ভারতবর্ষ কাঙ্গাল হইয়াছে—ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক এক বেলা মাত্র খাইতে পায়। এ কথার মানে এই যে, ভারতবর্ষের চাষা কাঙ্গাল হইয়াছে, ও চাষাদেরই ভিতরে অনেকের এক বেলা মাত্র খাওয়া জোটে। এ চাষা কাহারা? হাজার বিঘার মালিক যে সেও চাষা, আবার যাহার এক বিঘা জমি আছে সেও চাষা, আবার যাহার এক বিঘা জমিও নাই, অপরের অধীনে থাকিয়া চাষ করিয়া ভাগে কতকটা দানা পায় সেও চাষা। তাহা ছাড়া চম্পারণে আমি এমন হাজার হাজার চাষাও দেখিয়াছি যাহারা সাহেবদের ও দেশী লোকের কেবল গোলামী করে এবং সে গোলামী হইতে সারা জন্মেও মুক্তি পায় না। এই ভিন্ন ভিন্ন রকমের চাষার কোনটির সংখ্যা কত তাহার সঠিক ঠিকানা কখনো আমরা পাইব না। 'আদমসুমারী' অবশ্য হয়, কিন্তু চাষাদের অবস্থা বুঝার জন্য যদি 'আদমসুমারী' লওয়া হয় তবে তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ার মত ও লজ্জা পাওয়ার মত খবরই বাহির হইবে। আমার অভিজ্ঞতা এই—চাষার অবস্থা ভাল হওয়ার বদলে দিন দিনই খারাপ হইয়া যাইতেছে। খেড়া জেলাকে উন্নতশালী জেলা বলিয়া ধরা হয়। সেখানেও যে চাষা একখানা ভাল ঘর বাঁধিয়াছে সে উহা মেরামতে রাখিতে পারে না। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া ভরসা

হয় না। তাহার শরীরের দিকে দেখিলে দেখা যায় উহা মজবুত নয়। দেখা যায়—তাহাদের ছেলে-পেলেগুলি কাঠির মত শীর্ণ। গ্রামের ভিতরে মড়ক প্রবেশ করিয়াছে, আবার সংক্রামক রোগেও লোকে পীড়িত হইতেছে। বড় বড় পাটিদারেরা কর্জ্জের চাপে পিষ্ট হইতেছে। মাদ্রাজের গ্রামে গেলে ত শিহরিয়া উঠিতে হয়। আমার খেড়া ও চম্পারণ সম্বন্ধে যে গভীর অভিজ্ঞতা হইয়াছে মাদ্রাজের সম্বন্ধে তাহা নাই। তথাপি সেখানকার যে সকল গ্রাম আমি দেখিয়াছি তাহা হইতেই মাদ্রাজের চাষার ঠিক অবস্থা আমি বুঝিয়াছি।

ভারতবর্ষের পক্ষে ইহাই সব চাইতে বড় প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা কিসে হয়? এ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক খোঁজ লওয়া দরকার। ভারতবর্ষ ত শহরগুলির ভিতরে নাই, ভারতবর্ষ রহিয়াছে গ্রামের ভিতরে। যদি বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ইত্যাদি ছোট-বড় শহরের লোক-সংখ্যা যোগ করা যায় তবে উহা এক কোটির'ও কম হইবে। ভারতবর্ষের বড় শহরগুলির সংখ্যা যদি গুণিতে বসি তবে উহা শতখানেক মাত্র হয়। কিন্তু এক শত হইতে এক হাজার লোক বাস করে ভারতবর্ষে এমন গ্রামের অন্তই নাই। সেই জন্যই যদি আমরা শহরের উন্নতি করি, সংস্কার করি, সে চেষ্টার ফল আমাদের গ্রামে সামান্যই পৌছায়। যদি নালা-ডোবার সংস্কার করা যায়, আর যদি পাশের নদীতে ময়লা থাকে, তাহা হইলে যেমন তাহাতে কিছুই হয় না, শহরের বেলাতেও তাহাই। যেমন নদীর সংস্কার করিলে নালা-ডোবা নিজে নিজেই শুদ্ধ হয়, তেমনি যদি আমরা গ্রামের জীবন-যাত্রা শুদ্ধ করিতে পারি তবে আর সকলই আপনা আপনিই শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

'নবজীবনের' দৃষ্টি সর্ব্বদা চাষাদের উপরেই রহিয়াছে। এই অবস্থা কেমন করিয়া ভাল করা যায়? ইহা সংশোধন করিতে ছোট-বড় সকলেই কি অংশ লইতে পারে? যদি আমাদের ভিতর সম্মানার্হ এমন সব লস্কর পয়দা হয় যাহারা সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে পারে, তবে অল্প সময়েই আমরা কেমন করিয়া আগাইয়া যাইতে পারি তাহার বিচার পরে করিতেছি।

২

গত অধ্যায়ে আমরা চাষাদের অবস্থা সম্বন্ধে খানিকটা বিচার করিয়াছি। এখন এই অবস্থা কি করিয়া বদলানো যায় তাহারই বিচার করিতে হয়।

মিলায়োনেল কার্টিস যিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময়ে পরিচিত হ'ন, তিনি একটা প্রবন্ধে ভারতবর্ষের গ্রামের নিখুঁত চিত্র আঁকিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের গ্রামগুলি যেন আবর্জ্জনার স্তূপের উপর বসানো। গ্রামের কুটিরগুলি দেখিয়া মনে হয়—এ গুলি ধ্বংস-স্তূপ। লোকের শক্তি নাই। যেখানে-সেখানে মন্দির আছে বটে, কিন্তু গ্রামে পরিচ্ছন্নতা নাই। রাস্তায় ধূলা ত প্রচুর। মোটের উপর দেখিয়া মনে হয়—গ্রামের জন্য দায়ী হইবার কেহই নাই।

এই বর্ণনায় বেশী বাড়া-বাড়ি নাই। বরঞ্চ কোনো কোনো বিষয়ে আরো বাড়াইয়া বলাই দরকার। যেখানে গ্রামে ভাল ব্যবস্থা গড়িতে হয় সেখানে কতকগুলি নিয়ম পালন করা আবশ্যক। গ্রামের গলিগুলি যেমন-তেমন না হইয়া কোন এক বিশেষ আকারের হওয়া চাই, আর ভারতবর্ষে যেখানে কোটি কোটি লোক শুধু পায়ে চলে সেখানকার পথ-ঘাট এত পরিষ্কার হওয়া চাই যে, তাহার উপর চলিতে কেন, শুইয়া থাকিতেও যেন কোনো অসুবিধা বোধ না হয়। গলিগুলি পাকা হওয়া চাই ও জল বাহির হওয়ার জন্য নালা থাকা চাই। মন্দির ও মস্‌জিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই, তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখনই যেন নূতন বলিয়া মনে হয়। সেখানে যাহারা যায় তাহাদের উপর যেন শান্তি ও পবিত্রতার ছাপ পড়ে।

উহাদের সাথে ধর্ম্মশালা, স্কুল ও রোগীদের জন্য, যদি কুলাইয়া উঠে তবে একটা হাসপাতাল থাকা চাই। লোকের শৌচাদি নিত্য ক্রিয়ার এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যে, হাওয়া, জল ও রাস্তা নোংরা না হয়। প্রত্যেক গ্রামেরই স্থানীয় লোকের জন্য অন্ন-বস্ত্র গ্রামেই উৎপন্ন করার বা গড়িয়া লওয়ার শক্তি থাকা চাই। আবার চোর, ডাকাত ও ব্যাঘ্রাদির ভয় হইতে বাঁচার শক্তিও থাকা চাই। ভারতবর্ষের গ্রাম নিশ্চয়ই এককালে এই রকম ছিল। যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে সে সময় হয়ত ইহার দরকারই ছিল না। পূর্ব্বে থাকুক বা নাই থাকুক, আমি যে প্রকার গ্রামের বর্ণনা করিলাম ঐ প্রকার গ্রাম যে এখন নাই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই প্রকার গ্রামই স্বাবলম্বী হইতে পারে। যদি ভারতের সকল গ্রাম এই প্রকারই হয়, তবে হিন্দুস্থানকে অন্যান্য উপসর্গ কমই ক্লেশ দিতে পারে।

এই প্রকার অবস্থা আনয়ন করা অসম্ভব ত নয়ই, বরঞ্চ আমাদের এই বিশ্বাস হওয়াই দরকার যে, ইহাতে মুস্কিলও কিছু নাই। ভারতবর্ষে সাড়ে সাত লক্ষ গ্রাম আছে বলা হয়। তাহা হইলে এক এক গ্রামে লোক সংখ্যা গড়ে ৪০০ করিয়া পড়ে। অনেক গ্রামেই হাজারের কম লোক বাস করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে সব গ্রামে এই প্রকার কম লোকের বসতি সে সব গ্রাম ভাল করা খুবই সহজ। ইহা করার জন্য বড় বড় বক্তৃতা বা ব্যবস্থাপক-সভা হইতে আইন করার আবশ্যকতা নাই। আবশ্যক কেবল—যাহারা শুদ্ধভাবে কার্য্য করিতে পারে এমনি ধরণের গোণা-গাথা জনকতক স্ত্রী-পুরুষের। এই ধরণের লোকেরাই নিজেদের আচরণ ও সেবা-ভাব দ্বারা প্রত্যেক গ্রামে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন আনিতে পারে।

তাহাদিগকে যে দিন-রাত এই কাজেই পড়িয়া থাকিতে হইবে এমন নয়। তাহারা নিজেদের জীবিকার জন্য কাজ করিয়াও সেবা-বৃত্তির নিয়মানুসারে নিজের গ্রামের ভিতর গুরুতর পরিবর্ত্তন আনিতে পারিবে।

এই প্রকার সেবকদের বড় কিছু শিক্ষারও আবশ্যক নাই। যদি অক্ষর-জ্ঞান একেবারেই না থাকে তবুও গ্রাম-সংস্কারের কাজ তাহার দ্বারাও হইতে পারে। ইহার ভিতর সরকার বা রাজার আসার দরকার নাই। যদি প্রত্যেক গ্রাম হইতে এই শ্রেণীর স্বেচ্ছাসেবক বাহির হয়, তবে বিনা আড়ম্বরে, বড় আন্দোলন ছাড়াও সারা ভারতে কাজ হইতে পারে এবং খুব অল্প চেষ্টাতেই আশাতীত ফল পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে জিনিষ-পত্রেরও যে দরকার নাই তাহাও বুঝা যায়। ইহাতে আবশ্যক আছে একমাত্র সদাচার ও ধর্ম্ম-বৃত্তির।

আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, ইহাই চাষাদের অবস্থা ভাল করার সবার চাইতে সহজ উপায়। এই প্রকার চেষ্টায় কোনও গ্রামেরই অপর গ্রামের মুখ চাহিয়া থাকার দরকার নাই, কোনও লোকের অপর লোকের পথ চাহিয়া থাকারও দরকার থাকে না। যে গ্রামে কোনও একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের শুদ্ধ সেবা করার ইচ্ছা হয় ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই সে কাজ আরম্ভ করিতে পারে। আর ইহাতেই তাহার সারা ভারতবর্ষের মহৎ সেবার পুরাপুরি সমাবেশ হইয়া যায়। আমার আশা রহিল যে, গ্রামের পাঠকেরা আমার এই কথা পড়িয়া আমার প্রস্তাবিত পরীক্ষা সুরু করিয়া দিবেন ও অল্প সময়েই মধ্যেই নিজেদের পরীক্ষার ফলাফলও তাঁহারা দেশকে জানাইতে পারিবেন। এই পরীক্ষা কি ভাবে আরম্ভ করা যায় তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাঠকদিগকে জানাইব। কিন্তু যে

সেবক এই বস্তুর মহত্ত্ব বুঝিয়াছেন তাঁহার এই এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিবারও প্রয়োজন নাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিবেন বলিয়াই আমি আশা রাখি।

৩

আমি বলিয়াছি যে, গ্রাম্য ব্যবস্থা ভাল করার সম্বন্ধে আমার কতকগুলি অভিজ্ঞতার কথা বলিব। স্বর্গগতা ভগ্নী নিবেদিতা কলিকাতায় একটা পুল কি করিয়া মেরামত করিয়াছিলেন, ডাক্তার হরিপ্রসাদ তাহার উদাহরণ দিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এক একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোক যদি নিশ্চয় স্থির করে তবে কি না করিতে পারে? গ্রামের ভিতর এই প্রকার কাজ করা শহরের পুল মেরামত করানো অপেক্ষা ঢের সহজ। চম্পারণে যখন স্বাবলম্বী স্কুল স্থাপন করা ঠিক হইয়াছিল তখন স্বেচ্ছাসেবকদের ভিতর স্বর্গগত ডাক্তার দেব ও বেলগামের শ্রীযুত সোমন উকীল মহাশয় ছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের মাত্র তিনটা কাজ করিতে হইত। ছেলে-মেয়েরা আসিলে তাহাদিগকে পড়ানো, চার দিকের গ্রামের রাস্তা, ঘর ইত্যাদি সাফ রাখিতে গ্রামবাসীদিগকে শেখানো, আর পীড়িত লোক আসিলে তাহাদিগকে ঔষধ দেওয়া। যে সকল গ্রামে স্কুল ছিল ডাক্তার দেব সেই সকল গ্রামের তদ্বির করিতেন। এ দিকে ইঁহার বাসস্থান রাখিয়াছিলেন ভীতহারয়ার স্কুলে। সেখানকার লোকের ভিতর পরিবর্ত্তন আনা শক্ত ছিল। কি কি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহা ডাক্তার দেব দেখাইয়া দিতেন। কথা ছিল—রাস্তা সাফ করিতে হইবে ও কুয়ার আশে-পাশের কাদা সরাইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু গ্রামের লোক ডাক্তার দেবের কথা শুনিলে ত? অবশেষে শ্রীযুত সোমন ও ডাক্তার দেব নিজেরাই হাতে কোদাল লইয়া কুয়ার আশ-পাশ চাঁছু করিতে ও রাস্তা পরিষ্কার করিতে

লাগিয়া গেলেন। ঐ ছোট গ্রামে কথাটা বিদ্যুৎ বেগে প্রচার হইয়া গেল। গ্রামের লোকেরা ডাক্তার দেবের কথার অর্থ বুঝিল। ডাক্তার দেবের কার্য্যের ভিতর যে শক্তি ছিল তাঁহার প্রস্তাবে তাহা ছিল না। এইবার গ্রামের লোকেরা নিজেরাই সাফ করিতে লাগিয়া গেল। ভীতহারয়ার কুয়া ও রাস্তা দেখিতে দেখিতে সুন্দর হইয়া উঠিল। আবর্জ্জনার স্তূপ আর দেখা গেল না। কিন্তু এদিকে খড়ের যে স্কুল ঘরখানি তৈয়ার হইতেছিল, কোনও দুষ্ট উহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। কি করা যায়—তাহাই তখন এক বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিল। আবার যদি খড়ের ঘর করা যায় তবে ত পুনরায় পোড়াইয়া ফেলার আশঙ্কা আছে। শ্রীযুত সোমন ও ডাক্তার দেব তখন ইটের স্কুলবাড়ী তৈয়ার করা ঠিক করিলেন। তখন দুইজনেই বক্তৃতা দেওয়ার বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছেন। আবশ্যকীয় জিনিষ তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিলেন এবং যেখানে আবশ্যক কেবল সেইখানেই পয়সা খরচ করিলেন। তারপর উভয়েই মজুরী করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পাকা স্কুলবাড়ীর ভিত তাঁহারাই যখন পত্তন করিলেন, তখন গ্রামবাসীরাও আসিয়া পড়িল। কারিগরেরাও আসিয়া সাহায্য করিল। আজও ভীতহারয়ার স্কুল সাক্ষ্য দিতেছে যে, দুই একজন লোক কি করিতে পারে। এই ধরণের কাজ এক গ্রামে নয়, আরো অনেক গ্রামে আরম্ভ হইয়াছিল এবং সকল গ্রামেই কম-বেশী পরিমাণে কাজ হইতেছিল। শিক্ষকের কার্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে গ্রামবাসীরা কাজে লাগিয়া পড়িয়াছিল। এই সেবার কাজে বড় বেশী পৌরুষের দরকার ছিল না, দরকার ছিল একাগ্রতার ও অধ্যবসায়ের। উহার সঙ্গেই চতুরতা, নিপুণতা ইত্যাদি অপরের নিকট হইতে আসিয়া মিশিয়া যাইত।

খেড়া জিলায় শস্যের হিসাব করার দরকার হইয়াছিল। চাষারা সকলে সাহায্য না করিলে এ কাজ হইয়া উঠিতে পারিত না। এক এক গ্রাম হইতে এক এক জন স্বেচ্ছাসেবক যতটা খবর পাওয়া যায় তাহা লইত। কেবল তাহাই নয়, তাহারা চাষার মনও হরণ করিয়া লইত। আমি এমন অনেক দৃষ্টান্ত বিভিন্ন স্থানের সম্বন্ধে দিতে পারি।

আমরা যদি গ্রামগুলিকে সু-ব্যবস্থিত করিতে চাই, তবে কি ভাবে কাজ আরম্ভ করিব—তাহাই দেখা দরকার। স্বেচ্ছাসেবক যে গলিতে বাস করে সেই গলিই পছন্দ করিয়া লইবে। গলির সকল বাসীন্দার সহিত সে পরিচয় করিয়া লইবে। উহাদের দুঃখের অংশ লইবে, কিন্তু তাহাতে যেন আদৌ লোক-দেখানোর ভাব না থাকে। গলি পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তাহাদের সাহায্য চাহিবে। পড়শী হাসিবে, অপমানও করিবে—স্বেচ্ছা-সেবককে এ সকলই সহ্য করিতে হইবে। এ সব সত্ত্বেও পূর্ব্বের মতই তাহাকে তাহাদের দুঃখের ভাগী হইতে হইবে। সে একলাই গলি পরিচ্ছন্ন রাখিবে, তারপর তাহার মাতা-স্ত্রী-ভগ্নীরাও ধীরে ধীরে এই কাজে লাগিয়া যাইবে। পড়শীরা সাহায্য করুক আর না-করুক গলি এইভাবে বরাবরই পরিষ্কার থাকিবে। অভিজ্ঞতা হইতে আমি কথাও বলিতে পারি যে, এজন্য বেশী সময় লাগিবে না। অবশেষে পড়শীরা নিজেরাই কাজ করিতে লাগিয়া যাইবে এবং সেই গলির সুগন্ধ সারা গ্রামে ছড়াইয়া পড়িবে।

সেবকের যদি এই প্রকার কুশলতা থাকে ও সে নিজে যদি ঠিকমত শিক্ষিত হয়, তবে নিজের গলির ছেলে-পেলেকেও সে অক্ষর-জ্ঞান দিবে। যদি নিজের গলিতে কাহারও অসুখ হয় এবং সে চিকিৎসা করাইতে অপারগ

হয় তবে তাহার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বৈদ্য খুঁজিয়া আনিয়া দিবে। শুশ্রূষা করার কেহ না থাকিলে সে নিজেই শুশ্রূষা করিবে। এমনি ভাবে চলিলে প্রত্যেক পড়শীর আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার ঠিকমত জ্ঞান সে লাভ করিতে পারিবে। সেই জ্ঞান পাওয়ার পর তাহাদিগকে পরিবর্ত্তন করার জন্য যাহা করিতে হইবে সে ব্যবস্থা করা আর তখন কঠিন হইবে না। এমনি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তাহার নিজের পড়শীদের মধ্যে ও তাহাদের দ্বারা সারা গ্রামের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থার জ্ঞান আসিবে। এই বোধ হওয়ায় সাথে সাথে স্বেচ্ছাসেবকদের ভিতর যদি সেই শক্তি থাকে যাহার দ্বারা সকলকে এক সঙ্গে কাজে লাগানো যায় তবে তাহাদের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনও সঙ্গে সঙ্গেই হইতে পারে। আফ্রিকা, চম্পারণ ও খেড়া ইত্যাদি স্থানে আমি দেখিয়াছি যে, যাহাদিগকে আমরা অশিক্ষিত মনে করি তাহারা নিজেদের অধ্যবসায়ের জোরে ও লোক-প্রীতির শক্তি দ্বারা উন্নত ধরণের সেবা করিতে পারিয়াছে ও জন-সমাজের উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে। যে গ্রামে আমি একজনও সচেতন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখিয়াছি সেই গ্রামেই তাহাকে আমি খুব ভাল কাজ করিতেও দেখিয়াছি।

এখন পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে ও আমাদের শারিরীক নৈতিক ও আর্থিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কতকগুলি নিয়মের কথা বলিব। আমার আশা আছে, যাঁহারা এই নিয়মগুলি পছন্দ করিবেন তাঁহারা যদি এই নিয়ম অনুযায়ী নিজ নিজ গ্রামে কাজ আরম্ভ করেন তবে অল্প সময়েই গ্রামের উপর তাঁহারা যথেষ্ট প্রভাবও বিস্তার করিতে পারিবেন।

চাষাদের অবস্থা বিচার করা হইয়াছে। গ্রামে যে পরিচ্ছন্নতার নিয়ম চলে না তাহা আমরা দেখিয়াছি। খুব উচ্চ অবস্থায় উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ রোগ-ক্লিষ্ট হইলেও নিজেদের শক্তির প্রমাণ তাহারা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের যাহাদিগকে উন্নতির শীর্ষ-স্থানে তুলিতে হইবে তাহারা যদি রোগ-গ্রস্থ হয় তবে চলিতে গিয়াই তাহারা হাঁপাইয়া পড়িবে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"পরিচ্ছন্নতা দৈবী অবস্থার মত।" ময়লার ভিতর থাকিবার বা ময়লা আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিবার আমাদের কোনই কারণ নাই। ময়লার ভিতর পবিত্রতা থাকিতে পারে না। ময়লা অজ্ঞতার ও আলস্যেরই চিহ্ন। উহা হইতে চাষাকে কেমন করিয়া মুক্ত করা যায়?

পরিচ্ছন্নতার নিয়ম আলোচনা করা যাউক।

১। আমাদের অনেক অসুখের উৎপত্তি হয় পায়খানা হইতে, অথবা আমাদের জঙ্গলে মলত্যাগ করার অভ্যাস হইতে। প্রত্যেক বাড়ীতেই পায়খানার আবশ্যকতা আছে। সুস্থ ও বয়স্ক লোকেরাই জঙ্গলে যাইতে পারে। অপরের জন্য যদি পায়খানা না থাকে তবে তাহারা রাস্তায়, গলিতে বা বাড়ীতেই পায়খানা করিয়া জমিন নষ্ট করে ও হাওয়া বিষাক্ত করে। সেই জন্য এ সম্বন্ধে আমরা দুইটা নিয়ম পালন করিতে পারি। যদি জঙ্গলে যাইতে হয় তবে গ্রাম হইতে অন্ততঃ এক মাইল দূরে যাইতে হইবে। তাহার কাছাকাছি বসতি যেন থাকে না, লোকের যাতায়াত যেন থাকে না।

একটা গর্ত্ত খোঁড়া চাই তাহাতেই মল ত্যাগ করিয়া উহা মাটি চাপা দেওয়া চাই। যে মাটিটা খুঁড়িয়া তোলা হইয়াছিল তাহার সবটা চাপা দিলে মল ঠিক গর্ত্তে পোঁতা হইয়া থাকিবে। এই সামান্য কষ্টটুকু স্বীকার করা দ্বারাই পরিচ্ছন্নতার বড় নিয়ম পালন করা হয়। বুদ্ধিমান চাষা নিজের ক্ষেতেই শৌচ করে ও বিনাপয়সায় সার পায়—ইহাই এক নিয়ম।

কিন্তু জঙ্গলে যাওয়ার এই ব্যবস্থা করিলেও প্রত্যেক বাড়ীতেই পায়খানা থাকা চাই। সে জন্য কুঠরি তৈয়ার করিতে হয়। সেখানেও প্রত্যেক বার শৌচ করার পর মাটি চাপা দেওয়া চাই। তাহা হইলে দুর্গন্ধ আসিতে পারে না, মাছি ভন-ভনাইতে পারে না, পোকা উৎপন্ন হইতে পারে না। ঐ কামরা সব সময় ঠিকমত সাফ থাকা দরকার।··· ······· মাটির এক ফুট নীচে পর্য্যন্ত জীবে ভরা। অতটা নীচে যদি ময়লা পোঁতা হয় তবে উহা শীঘ্রই সার হইয়া যায়। খুব নীচে মাটিতে এত জীব নাই যে, মলকে সার করিতে পারে। সেই জন্য বেশী নীচে মল পুঁতিলে মল হইতে খারাপ বাষ্প হইয়া হাওয়া খারাপ করে। পায়খানা লোহার দ্বারা বা প্রস্তর দ্বারা অথবা মাটির করিলেও চলে। উহাতে খরচা নাই কেবল পরিশ্রমের আবশ্যক। যেখানে-সেখানে প্রস্রাব করাও উচিত নয়। গলিতে প্রস্রাব করা পাপ বলিয়া জানিবে। প্রস্রাবের জন্য গর্ত্ত খুড়িয়া রাখিবে উহাতেও প্রচুর মাটি দিলে মোটেই দুর্গন্ধ আসিবে না, ছাট উঠিবে না ও মাটিতে সারও হইবে—ইহাই দ্বিতীয় নিয়ম। প্রত্যেক চাষা যদি এই নিয়মগুলি পালন করে তবে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। কেবল তাহাই নয় উহাতে তাহার আর্থিক লাভ হইবে, কেন না বিনা পয়সায় সোনার সার পাওয়া যাইবে।

২। পথের উপর থুথু ফেলিবে না, নাক ঝাড়িবে না। কাহারও কাহারও থুথু এত বিষাক্ত যে, উহাতে জীবাণু উঠিয়া ক্ষয়-কাশ হয়। রাস্তায় থুথু ফেলাও দোষের। পান-জরদা খাইয়া যাহারা পিক্ ফেলে তাহারা ত অপরের সুবিধা-অসুবিধার দিকে দেখেই না। থুথু ইত্যাদির উপর ধূলা ছিটাইয়া দেওয়া উচিত।

৩। চাষারা জলের সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন। যে কুয়া-পুকুর হইতে পানীয় জল তোলা হয় তাহা সাফ রাখা আবশ্যক। যেন পাতাটিও না পড়ে। উহাতে স্নান করিতে নাই। উহাতে পশ্বাদিকে স্নানের জন্য নামাইতে নাই ও কাপড় কাচিতে নাই। ইহাতে প্রথমে কেবল কতকটা পরিশ্রম করিতে হয়। কুয়া সাফ রাখা ত সহজ কথা। পুকুর সাফ রাখা কঠিন। কিন্তু লোকে শিক্ষা পাইলে সবই সহজ হয়। খারাপ ও ময়লা জল পান করিতে যদি বিশ্রী লাগে, তবে পরিচ্ছন্নতার নিয়ম সহজে পালন করিতে পারা যাইবে। মোটা পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া জল ব্যবহার করিবে।

এক বৃদ্ধা এক টেবিল সাফ করিতে ছিল। সাবান দিয়া ধুইয়া ন্যাতা দিয়া পুঁছিতে ছিল। কিন্তু যতবারই সাফ করে সাফ আর হয় না। বুড়ী সাবান বদলাইল ও ন্যাতা বদলাইয়া অন্য ন্যাতা লইল কিন্তু টেবিল যেমন ঠিক তেমনি থাকে, সাফ হয় না। অবস্থা দেখিয়া একজন বলিল—"বুড়ী মা, ন্যাতা ফেলিয়া দিয়া সাফ কাপড় লও তাহা হইলে এখনি টেবিল সাফ হইবে।" বুড়ী বুঝিল। তেমনি ময়লা কাপড় দিয়া ছাঁকা বা পোছার চাইতে না-ছাঁকা, না-পোছা ভাল।

গলি-পথে যে আবর্জ্জনা ফেলিতে নাই—এ কথা ত বুঝাইতেই হইবে না। আবর্জ্জনা ফেলিবারও নিয়ম আছে। লোহা, কাঁচ ইত্যাদি গভীর গর্ত্তে

পুঁতিবে। দাঁতন চিরিয়া ধুইয়া ও ছোট গাছ-পালা শুখাইয়া জ্বালাইবার কাজে লাগাইবে। ছেঁড়া-ন্যাকড়া বিক্রয় করা যায়। উচ্ছিষ্ট, শাকের খোসা ইত্যাদি পুঁতিয়া ফেলিবে ও তাহা হইতে সার হইবে। ছেড়া-ন্যাকড়া হইতে কাগজ হয়। গ্রামের ভিতর আবর্জ্জনা উঠাইয়া লওয়ার লোকের দরকার নাই, কেন না আবর্জ্জনা খুব কমই হয় ও উহা প্রধানতঃ সারে পরিণত করা যায়।

গ্রামের বা বাড়ীর আশে-পাশে জলে ভরা খাল-ডোবা রাখিতে নাই। জল ভরা না থাকিলে মশা হয় না। দিল্লীর আশে-পাশে জলা ছিল। উহা ভরাট করার পর মশা বেশ কমিয়াছে, ম্যালেরিয়াও কমিয়াছে।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন—এই সকল পরিচ্ছন্নতার নিয়মের ভিতর কি আর এমন আছে? কিন্তু এই নিয়মগুলি পালন করার উপরই একুশ কোটি চাষার স্বাস্থ্যের ভিত্তি রহিয়াছে। যে স্বেচ্ছাসেবক সব এই নিয়ম নিজের গ্রামে চাষাদিগকে শিক্ষা দিবে সে নিজের গ্রামের মান বাড়াইবে, রোগ বন্ধ করার বড় উপায় প্রয়োগ করিবে। এই কাজ সবার চাইতে কঠিন, কেন না কম লোকই ইহাতে রস পায়। এই ধর্ম্ম-পালনে ভুল হওয়ার কোনও ফাঁক নাই। যতটুকু পালন করা যায় ফল ততটুকুই হইবে। যাহার এই কাজ আরম্ভ করার ইচ্ছা আছে সে তাহা করিয়া এক বৎসরের মধ্যে গ্রামের হাল বদলাইয়া ফেলিতে পারে।

সম্পূর্ণ